প্রথম প্রকাশঃ ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

Periodical Issue : 427
1 January 2017
USPS No. : 020877
ISN : 1542 5657

সংবাদ বিচিত্রা

SANGBAD BICHITRA

প্রকাশনায় ঃ বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL NORTH AMERICA

৪৪ তম বর্ষ | ১৬ পৌষ ১৪২৩ | ১ জানুয়ারী ২০১৭

দিল্লিতে মেজাজ হারালেন মমতা

ভোটরাজনীতির নয়া বস্তু হিসেবে যদি ধরা যায়, তার তুলনা থেকে অন্যতম কান্ডারির মেজাজ যেমন বাজারকথা, রাহুল গান্ধীর সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেজাজও তেমন ছিল। নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক, কিন্তু সার্বিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত।

তাল কাটল আচমকা। কংগ্রেস সহ-সভাপতির উদ্দেশ্যে সাংবাদিকদের ভিড় থেকে ভেসে এল প্রশ্ন, 'একদিকে তৃণমূল, অন্যদিকে ডিএমকে। রাহুলজি...' প্রশ্ন শেষ হল না। মাঝপথে কাটলেন তৃণমূল নেত্রী। আদর্শ পার্টনারশিপে সিনিয়রের মতোই রাহুলের দিকে ধেয়ে যাওয়া বাঁকা প্রশ্নের অভিমুখ ঘোরালেন নিজের দিকে। ঈষৎ মেজাজ হারিয়ে বললেন, 'ওঁকে কেন প্রশ্ন করছেন? আমার দল নিয়ে যদি কোনও প্রশ্ন থাকে, তা হলে সেটি আমাকেই করুন। জানিয়ে রাখি, দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেসের গায়ে কোনও দাগ নেই। একেবারে সাফ।'

সাংবাদিক বৈঠকের একেবারে শেষে মমতা যখন চলে যাচ্ছেন, তখন তাঁকে ঘিরে ধরে কৈফিয়তি সংবাদমাধ্যমের বুম। ভিড় ঠেলে প্রশ্ন আসে ধূলাগড়ি নিয়ে। ফের একবার

বিরক্ত হন মমতা। বলেন, 'কী হয়েছে ধূলাগড়িতে? কিছু হয়নি। সব ঠিক আছে।'

এর বাইরে কেমন ছিল এ দিনের বৈঠক? এককথায়, আট বিরোধী দলের সাংবাদিক বৈঠক হয়ে দাঁড়াল মমতা-রাহুল জুটির আত্মপ্রকাশের মঞ্চ। আয়োজক হিসেবে নিঃসন্দেহে রাহুলের উপরে একটি বাড়তি চাপ ছিল। সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি এবং বাম

এরপর ৫ পাতায়

শুধু ফিতে কাটার জন্য প্রধানমন্ত্রী হইনি, দুর্নীতি সাফ করবই: মোদি

কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধীকে উচিত জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেরাদুনের এক সভায় রাহুলের অভিযোগ খারিজ করতে গিয়ে মোদি বলেন, তাঁর সরকার গরিবদের জন্যই কাজ করছে। সম্প্রতি রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেছিলেন, কর্পোরেট ও বড়লোকদের স্বার্থে কাজ করছে মোদি সরকার। মোদি বলেন, নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের ফলে কালো টাকা ধ্বংস হচ্ছে, সন্ত্রাসবাদীদের অর্থে ভাটা পড়েছে, মানব ও মাদক পাচার বন্ধ হচ্ছে। তাঁর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করায় বিরোধী নেতাদের একহাত নিয়ে মোদি বলেন, এই সিদ্ধান্ত কয়েকজনের পছন্দ হচ্ছে না। কারণ এর ফলে চোরেদের সর্দার বিপাকে পড়ছে। পূর্বসূরিদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি স্রেফ ফিতে কাটার জন্য প্রধানমন্ত্রী হননি। নিজেকে দেশের চৌকিদার বলে উল্লেখ করে মোদি বলেন, তিনি চৌকিদারি করছেন বলে অনেকে সমস্যায় পড়েছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের এই সাফাই অভিযান আগামীদিনেও চলবে।

উত্তরাখণ্ডে আগামী বছরেই ভোট। দলের পালে হাওয়া তুলতে এদিন

দেরাদুনে বিজেপির পরিবর্তন মহাযাত্রাতে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর সরকার গরিবদের জন্য কতটা দায়বদ্ধ এদিন ব্যাখ্যা করেন তিনি। বলেন, সরকারের হাজার দিনের মধ্যে ১২ হাজার গ্রামে বিদ্যুতায়ন হয়েছে। হাজার গ্রামে কাজ চলছে। এরপরেই তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে জনতাকে প্রশ্ন করেন, এটা কি গরিব মানুষের জন্য কাজ নয়? ইউপিএ সরকারের সঙ্গে তাঁর সরকারের কাজের তফাৎ বোঝাতে গিয়ে মোদি বলেন, পূর্বতন সরকার ভরতুকির সিলিন্ডার ৯ থেকে বাড়িয়ে ১২ করেছিল। এটাকে তাঁরা বিশাল বড় সিদ্ধান্ত বলে প্রচার করে। অথচ তাঁর সরকার দারিদ্র সীমার নীচে থাকা পাঁচ কোটি মানুষকে গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছে দিয়েছে।

এরপরেই নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে মোদি বলেন, আপনারা কি আমাকে শুধু ফিতে কাটার জন্য আর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মোমবাতি দিয়ে আলোক জ্বালানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন? আপনারা কি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে ও তা বন্ধ করতে আমাকে মসনদে বসাননি? আমরা কি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করব না? এরপরে তিনি বলেন, আপনারা আমাকে চৌকিদারের কাজ দিয়েছেন। আমি সেই চৌকিদারি করছি বলে বেশ কিছু লোক মুশকিলে পড়ে গিয়েছেন। মোদি বলেন, পিছন দরজা দিয়ে কালো টাকা সাদা করার চেষ্টা চলছে। ভাবছে মোদি দেখতে পাবে না। কিন্তু আমরা

এরপর ২০ পাতায়

মমতার দয়ায় মোদি প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেননি: বেঙ্কাইয়া

সন্দীপ স্বর্ণকার • নয়াদিল্লি

নোট বাতিলের শেষ লগ্নে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিশিষ্ট মন্ত্রী বেঙ্কাইয়া নাইডু। সম্প্রতি দিল্লি গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ইস্তফা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী। বলেছিলেন, ৩০ তারিখের পর কি প্রধানমন্ত্রী ইস্তফা দেবেন? সেই প্রসঙ্গে মমতার উদ্দেশে তোপ দেগে বিজেপি মন্ত্রী বললেন, মমতার হুঁশিয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী ইস্তফা দিতে যাবেন কোন দুঃখে? মমতার দয়ায় কি নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন? দেশের মানুষের বিপুল সমর্থন পেয়েই তিনি প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেছেন। পাশাপাশি বিরোধী ঐক্য নিয়ে কটাক্ষ করেন তিনি। রাহুল-মমতার নাম না করে তাঁদের অসুরবলে খোঁচা দিতেও ছাড়েননি তিনি। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি বলেন, দিল্লিতে দোস্তি, আর কেরল-বাংলায় কুস্তি। এখানে কো-অপারেশন আর রাজ্যে সেপারেশন। তাই এই বিরোধী জোটের সঙ্গে মানুষ নেই। মোদির সঙ্গেই আছেন জনগণ। ভবিষ্যতেও থাকবে। দেখুন না আগামী বছর রাজ্যগুলির ভোটেকী হয়!

এদিন ন্যাশনাল মিডিয়া সেন্টারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বেঙ্কাইয়া নাইডু বলেন, নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত হল দুর্নীতি বিরোধী টিকা মাত্র। অ্যান্টি-স্ক্যাম ভ্যাকসিন। ধীরে ধীরে আরও দাওয়াই আছে। কেউ যদি ভেবে থাকে নোট বাতিল করেই থেমে যাবেন মোদি, তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। যে টাকা ব্যাঙ্কে ফিরে এসেছে, তার বিস্তারিত হিসাব পরীক্ষা

করে প্রয়োজন মতো ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। কেউ যদি মনে করেন, হিসাব বহির্ভূত টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে বেঁচে গেলাম। অগ্রিম তাঁরা সাবধান হয়ে যান।

নোট বাতিলের ঘোষণা হওয়ার পরেই সবাই আগে কলকাতায় বসে প্রতিবাদে সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাষ্ট্রপতির কাছে দরবার থেকে শুরু করে দিল্লিতে

এরপর ২৩ পাতায়

একটু ভাবলে কিন্তু চাষির দুর্গতি কমত

সোমদীপ চট্টোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় সরকারের কিসান ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পটির সফল রূপায়ণ হলে আজ চাষিরা তার সাহায্যে এটিএম থেকে টাকা তুলতে পারতেন

নোটবন্দির ফলে গ্রামে গ্রামে গরিব চাষি কতখানি দুর্দশায় পড়েছেন, তা নিয়ে স্বভাবতই উদ্বিগ্ন অনেক রাজনৈতিক নেতা এবং বরিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের কিসান ক্রেডিট কার্ড (কেসিসি) চাষির জন্যই তৈরি হয়েছিল। প্রকল্পটির যথাযথ রূপায়ণ হয়ে থাকলে কেসিসি ব্যবহার করে চাষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে, বা টাকার জোগান থাকলে এটিএম থেকে টাকা তুলতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু কেসিসি-র সদ্ব্যবহার কি আদৌ হচ্ছে এ দেশে?

ব্যাঙ্কের সঙ্গে চাষির সম্পর্ক তৈরির কথা ছিল কেসিসি-র স্বল্পহারে সুদ, সহজ শর্তে ঋণ, নমনীয় ঋণশোধ, এই ছিল কেসিসি-র উদ্দেশ্য। প্রয়োজন মতো টাকা ধার পেলে চাষি আরও ভাল প্রযুক্তি ব্যবহার করবে, উৎপাদন আরও বাড়াবে, এমনই মনে করা হয়েছিল। ১৯৯৮ সালে শুরু হওয়ার পর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে কেসিসি। নাবার্ডের তথ্য অনুযায়ী, প্রকল্পের সূচনা থেকে শুরু করে ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষ অবধি শুধুমাত্র সমবায় ও আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কেই পাঁচ কোটির ওপর সক্রিয় কেসিসি অ্যাকাউন্ট আছে। কিন্তু অধিকাংশ চাষি কি কেসিসি ব্যবহার করে উন্নত চাষ, বেশি রোজগার, সহজ ঋণের সুযোগ পাচ্ছেন?

চাষের উপর ব্যাঙ্কের কৃষিঋণের প্রভাব যে রয়েছে, তা ধরা পড়ছে গবেষণায়। ভারতে পনেরো বছরের ধান উৎপাদনের তথ্য (১৯৮৬-২০১১) থেকে দেখা যাচ্ছে, যে সব জেলায় কেসিসি বিতরণের পরিকাঠামো ভাল, চাষিদের কাছে কেসিসি তুলনায় সহজলভ্য, সেখানে ধানের উৎপাদন বেশি। গড় উৎপাদনের চাইতে প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি উৎপাদন হচ্ছে সেই সব জেলায়। এমনকী অধিক উৎপাদনশীল বীজ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, এই সব জেলাগুলি অন্যান্য এলাকার চাইতে এগিয়ে রয়েছে। মানে এই তারতম্য যে কেসিসি-র জন্যই হচ্ছে, অন্য কারণে নয়, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে কেসিসি বিতরণ শুরু হওয়ার আগের দশ বছর ও পরের দশ বছরের ফলনের তথ্য মিলিয়ে দেখা হয়েছে। তাতে স্পষ্ট হয়েছে, কেসিসি বিতরণ ও ব্যবহারের পরিকাঠামো যে সব এলাকায় দ্রুত উন্নত হয়েছে, সেখানেই বাড়তি ফসল হচ্ছে।

অথচ কেসিসি-র সঙ্গে বাড়তি ফলনের সম্পর্ক ঠিক কী, সেটা স্পষ্ট নয়। চাষির স্বল্পসুদে ঋণের প্রয়োজন আছে, এটা যদি ধরে নেওয়া যায়, তা হলে কেসিসি-র মতো প্রকল্পের সুযোগ পেলে তাঁরা বেশি ঋণ নেবেন, এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কেসিসি আসার পর চাষি পরিবারগুলি যে বেশি ঋণ নিচ্ছে এমন নয়। এমনকী তাঁরা যে ঋণের জন্য ব্যাঙ্ককেই বেশি পছন্দ করছেন, এমনও নয়। ঋণ নেওয়ার হার, গৃহীত ঋণের মোট অঙ্ক, অশোধিত ঋণের অঙ্ক, একাধিক জায়গা থেকে ঋণ, কোনও বিষয়েই কেসিসি-র কোনও প্রভাব দেখা যাচ্ছে না। চাষিদের একটা বড় অংশের ঋণচিত্র কোনও পরিবর্তনই আনেনি কেসিসি।

লাভ হচ্ছে কেবল সেই সব পরিবারের, যাদের আগে থেকে ব্যাঙ্কের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। ফসল উৎপাদনও বাড়ছে তাদেরই বেশি। কারণ তাঁরা অন্য উৎস থেকে বেশি সুদে টাকা না নিয়ে, ব্যাঙ্ক থেকে কম সুদে টাকা নিচ্ছেন। তাতে পাওনাদারের সংখ্যা কমেছে। যদিও মোট ঋণের অঙ্ক বাড়েনি এঁদের ক্ষেত্রেও। তা হলে উৎপাদন বেশি হচ্ছে কী করে? তার একটি সম্ভাব্য কারণ, এই চাষিরা আগে দুঃসময়ের কথা ভেবে যে টাকাটা জমাতেন, সেটা এখন খরচ করছেন চাষের কাজে। প্রয়োজন হলে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়া যাবে, এই নিশ্চয়তা এঁদের প্রত্যয় জুগিয়েছে সঞ্চয় কম রেখে চাষে বেশি বিনিয়োগ করার। অর্থনীতির ভাষায় বলা যেতে পারে, এই চাষির ঝুঁকি সহ্য করার ক্ষমতা (রিস্ক টলারেন্স) বেড়েছে।

এ থেকে ইঙ্গিত মিলছে, যাঁদের একাধিক জায়গা থেকে ঋণ নেওয়ার সুবিধে আগেই ছিল, কেসিসি তাঁদের সেই সুবিধেকে আরও বাড়াচ্ছে। তাতে সামগ্রিক ভাবে চাষে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে কিন্তু ক্ষুদ্র চাষির হাল ফেরেনি। কেসিসি তাঁদের অধিকাংশের কাছে ব্যাঙ্কের ঋণকে পৌঁছে দিতে পারেনি। হয় তিনি কেসিসি পাননি, অথবা কার্ড হাতে পেলেও তা ব্যবহার করে ঋণ নিতে পারছেন না। এ বিষয়ে এই গবেষকের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ হল এই যে, ধনী চাষি পরিবারগুলির হাতে অনেকগুলি করে কেসিসি থাকছে, তা ব্যবহার করে তাঁরা অনেক টাকা তুলছেন। ব্যাঙ্কের খাতায় কেসিসি-র সংখ্যা এবং কৃষি ঋণের অঙ্ক, দুটোই অনেক বেশি দেখাচ্ছে। কিন্তু চাষিদের বড় অংশ সেই সুযোগের বাইরে থেকে যাচ্ছেন।

নাবার্ডের তথ্যেও এই বিভাজনের কথা বলছে— ২০০৪ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে সেই সব ঋণের অ্যাকাউন্ট, যার অঙ্ক দু'লক্ষ টাকার কম। ওই একই সময়ে এক কোটি টাকার বেশি ঋণের অ্যাকাউন্টের সংখ্যা বেড়েছে আটগুণ।

কিসান ক্রেডিট কার্ড ক্ষুদ্র চাষিকে ব্যাঙ্কের আওতায় আনার সুযোগ তৈরি করেছিল। সে সুযোগ যদি ঠিক সময়ে কাজে লাগানো যেত, তা হলে আজ গরিব চাষির কথা ভেবে হাহুতাশ করতে হত না। এটিএম যখন নোটভর্তি হবে, তখনও নগদবন্দি হয়ে থাকবে চাষি। ঋণবন্দি থাকবে মহাজনের খাতায়।

সৌজন্যে— আনন্দবাজার পত্রিকা

রাজ্যের নামবদল নিয়ে বিতর্ক হল কি?

ভাষাতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদদের মতামত সে ভাবে শোনা গেল না। পক্ষেই হোক বা বিপক্ষে, কথা বললেন শুধু রাজনীতিবিদরা। লিখছেন শুভেন্দু দাশগুপ্ত

এই বছরের গত তিরিশে আগস্টের কাগজে প্রথম পাতায় জানা গিয়েছিল, বড়োসড়ো অঘটন কিছু না ঘটলে, এবার 'পশ্চিমবঙ্গ' নামটি লেখার দিন বুঝি শেষ হয়ে এল। এখন শুধু বেশ কিছু সম্মতি, সই-সাবুদ আর সময়ের অপেক্ষা। তবে বিমুদ্রাকরণের প্রেক্ষাপটে এই বছর যখন শেষ হতে চলল, তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী বাংলার এই নাম-পরিবর্তন নিয়ে আদৌ ভাবছেন না, বিষয়টাকে ক্রমশ ঠেলে রেখেছেন লক্ষণীয়, দেশে কোনো একটি অঙ্গরাজ্যের নামকরণে পরিবর্তন নিয়ে যে-বিতর্কটি হওয়া উচিত ছিল ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে, ইতিহাসবিদদের মধ্যে সেই বিতর্ক এবারে ঘটল না। নাম-পরিবর্তনের পক্ষে বা বিপক্ষে কথা বললেন কেবল রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা।

নাম পরিবর্তন কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের নাম ইংরেজিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল বলে, বর্ণানুক্রমিক ভাবে, সেখানকার প্রতিনিধিদের ডাক পড়ে সকলের শেষে। তখন হয় এখানকার লোকেদের কথা শোনার লোক সভায় থাকে না আর যদি বা কেউ থাকেন তো তাঁরাও তখন ক্লান্ত। তা হলে দেখা গেল, বাংলার প্রতি বঞ্চনার মূলে বুঝি বা রয়েছে ওই ডব্লিউ-এর দুর্গ্রহ। তাই পশ্চিমবঙ্গকে বাংলা বা ইংরাজিতে বেঙ্গল করলে একলাফে ডব্লিউ থেকে বি হলে অনেকখানি এগিয়ে আসবে বাংলার অবস্থান। সংসদীয় ক্ষেত্রে এতেই বিশেষ সুবিধা পাওয়া যেতে পারে জেনে, অনেক বাঙালিও আহ্লাদিত। এই নামান্তরের ফলে, সর্বভারতীয় যে কোনও আলোচনায় বাংলার প্রতিনিধিরা পূর্বের তুলনায় অনেক আগে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পাবেন।

কৌতূহলী মনে প্রশ্ন জাগল, এবারও তা হলে শেষের দিকে যে অঙ্গরাজ্যের ডাক পড়বে তারা হল উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড। তামিলনাড়ু-ও শেষের দিকেই ছিল, আসাম ছিল প্রথম দিকেই। বর্ণানুক্রমিক ভাবে তাতে কি তামিলনাড়ুর চেয়ে অসম বেশি এগিয়ে গিয়েছে? কিংবা কর্নাটকের তুলনায় মণিপুর বা মেঘালয় কি এই বর্ণানুক্রমিক ভাবে পরে বলেই পিছিয়ে পড়েছে?

সংসদীয় নিয়মে আগে ডাক পাওয়ার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গলকে বেঙ্গল করব, এটা নাম বদলের পক্ষে যথেষ্ট কারণ হতে পারে কি? এই নিয়ম যদি সংসদে কোনও কথা বলার জন্য একটা সমস্যা হয়, তা হলে সংসদের সেই নিয়মটিকে পরিবর্তন করার কথা বলা বেশি জরুরি। বলা দরকার ছিল, কোনও এক বিষয়ে যদি বর্ণানুক্রমে এ থেকে জেড-এর ঊর্ধ্বক্রমে ডাক পড়ে তা হলে পরের বার জেড থেকে এ-তে নাম ডাকা হোক। এই দাবিটি সংগত হতে পারে, কিন্তু ওই যুক্তিকে অনড় জেনে মানব বলে, সকল অঙ্গরাজ্যই যদি নিজের নাম বদলে উদ্যোগী হয় তা হলে সে ভারি চিন্তার কথা!

পশ্চিমবঙ্গে নামের পক্ষে বা বিপক্ষে তর্ক করতে গিয়ে কেউ বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ কেন হবে, পূর্ববঙ্গ বলে তো কিছু এখন নেই আদৌ। কেউ বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ নামের মধ্যে দেশভাগের যে-ভয়ঙ্কর স্মৃতি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, তা মুছে ফেলা দরকার, কারও বা মনে হয়েছে, সেই স্মৃতি যত ভয়ঙ্করই হোক, তা ইতিহাসের খাতিরে শব্দের মধ্যে অন্তত বেঁচে থাক উত্তরকালের জন্য। তা ছাড়া, ব্যবহারিক কথায় সীমায় বঙ্গের চেয়ে কেন বাংলা-র দাবি বেশি, তর্ক তা নিয়েও হতে পারে। কিন্তু পক্ষে-বিপক্ষে এই আন্তরিক বিতর্ক কি সে ভাবে হল?

তবুও, পশ্চিমবঙ্গের নাম বদল হয় কিনা বা হলেও নিজের নাম বদলে নিজের উন্নতি আমাদের প্রিয় অঙ্গরাজ্য ঘটাতে পারে কি না, বা নাম বদল না-হলেও নিজস্ব ছন্দে তার উন্নতি অব্যাহত থাকে কিনা সেই উত্তরের সন্ধান হয়ত এই ২০১৭-য় পাওয়া যাবে।

সৌজন্যে— এই সময়
২৮/১২/১৬

৮ নভেম্বরের পর বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ৬০ লক্ষ অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে ৭ লক্ষ কোটি টাকা, তথ্য দেখে চোখ কপালে উঠেছে আয়কর দপ্তরের

৮ নভেম্বর নোট বাতিলের ঘোষণার পর দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে প্রায় ৭ লক্ষ কোটি টাকা। জমা করেছে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সংস্থা। যাদের সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। প্রধানমন্ত্রী নোট বাতিলের ঘোষণার ৫০ দিন পর এই তথ্য দেখে চোখ কপালে উঠেছে আয়কর দপ্তরের। কেন্দ্রীয় সরকার হুঁশিয়ারি দিয়েছে, কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা সংস্থা যদি তাদের আয়ের সঠিক উৎস দেখাতে না পারে, তাহলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। ব্যাঙ্কে জমা করে দেওয়া মানেই কালো টাকা সাদা হয়ে যাবে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের এক শীর্ষ অফিসার জানিয়েছেন, সঠিক ডিপোজিটরকে কোনওরকম হেনস্তা করা হবে না। কিন্তু কোনও ফোরাম যদি তাদের কালো সম্পত্তি সাদা করার প্রচেষ্টা করে, তাহলে ব্যবস্থা নিতে কোনওরকম দ্বিধা করবে না কেন্দ্রীয় সরকার। নোট বাতিল ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার মাধ্যমে কালো টাকা ঘোষণার সুযোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাঁরা এখনও ঘোষণা করেননি বা কর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের কোনওরকম ভাবে রেহাই দেওয়া হবে না। নোট বাতিলের ৫০ দিন পর কালো টাকা নিয়ে আরও কঠোর অবস্থান নিতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। ওই সরকারি আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, অনেকেই ভাবছেন ব্যাঙ্কের সাহায্যে তাঁদের কালো টাকা সাদা করে নিতে পারবেন। এমনটা কিন্তু নয়। যাঁরা ২ লক্ষ, ৫ লক্ষ বা তার বেশি টাকা ব্যাঙ্কে জমা করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করা শুরু হয়েছে। ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট নম্বর, অতীতে কত টাকা জমা পড়েছে ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। কোনওরকম অসংগতি পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। যে সব ব্যক্তির একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোঁজ নেওয়া হবে তাদের সম্পর্কেও। অন্য ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে কর ফাঁকির প্রচেষ্টা মতো বিষয়ও আয়কর দপ্তরের নজরে পড়েছে। আয়কর দপ্তর জানিয়েছে, ৬০ লক্ষের বেশি ব্যক্তি, কোম্পানি এবং প্রতিষ্ঠান ৭ কোটি টাকা জমা করেছে। এই সংখ্যা চমকে দেওয়ার মতো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

সৌজন্যে: বর্তমান ৩০/১২/১৬

‘খালি হাতে’ শ্বশুরবাড়ি পাঠানো যায়!

মারা গিয়েছেন কাজল বর্মন। আরও কিছুদিন আগে মিতা মণ্ডল। কারণ, পণ। ট্র্যাডিশন চলিতেছে। লিখছেন রূপসা রায়

বিয়ে হওয়ার আট দিনের মাথায় লাশ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন সোদপুরের বুড়ি বাওইবাড়ির (শ্বশুরবাড়ি সেখানেই ছিল বলে কথা) কাজল বর্মন। অভিযোগ চাহিদামতো পণ না পেয়েই শ্বশুরবাড়ির লোকজন খুন করেছেন তাঁকে। এই ঘটনার মাস দুয়েক আগে সংবাদ শিরোনামে আর একজন মেয়ে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের উজ্জ্বল ছাত্রী, মিতা মণ্ডল। তাঁকে খুন করা হয়েছিল না কি আত্মহত্যা করেছিলেন তিনি সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। তবে কাজলের ও মিতার মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে কারণটি অবশ্য এক— পণের দাবি।

পণপ্রথা খারাপ, সে তো শৈশব থেকেই জানি আমরা সকলে। পণ দেওয়া মানে যে কার্যত মেয়েকে বিক্রি করে দেওয়া, অন্য বাড়িতে মেয়ের ভরণপোষণের জন্য খানিকটা বিনিয়োগ, এবং রং যত কালো, দাম তত ভালো, এই দর্শনের এপর ভর করে স্থির হয় পণের বাড়া-কমা, এ সব কি আমরা জানি না? কাজল বা মিতাও জানতেন বলে ধরে নেওয়া যায় কারণ দুজনেই উচ্চশিক্ষিত। স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। তবু কেন রাজি হলেন এমন বিয়েতে? এমন তো নয় আর পাঁচটা গ্রামীণ সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মতো তাঁদের দায় ছিল কোনও পরিবারে আর্থিক অসুবিধা থাকলেও খুব কম করে হলেও একটি সাধারণ চাকরি করার মতো যথেষ্ট যোগ্যতা তাঁদের ছিল। অন্তত পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত না। তবু তাঁরা এমন একটি পথে হেঁটেছেন, যেখানে হয়তো খুব সন্তর্পণে চার চাকা গাড়ি, নগদ দশ লক্ষ টাকা, আই ফোন বা বরের মদ খাওয়াটুকু মেনে নেওয়ার বিনিময়ে খানিকটা সুখের স্বপ্ন ছিল। একটা গৃহশান্তির অঙ্গীকার ছিল। হয়তো নিজের কাছেই।

আজকাল আসলে কোনও বিয়েতেই পণ নেওয়া হয় না। এটা একটা খুব সত্যি কথা। বাবা-মার একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠান, এই যা। আমার এক বন্ধু, ওই যাদবপুরেরই, নিজের বিয়ের আগে আমার সঙ্গে কেনাকাটা করতে গিয়ে হঠাৎ বলে বসল, ‘চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, জলের মতো বাবার সব টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি না বাটিটা কোন কোম্পানির হলে ভালো হয়। তার মধ্যে শ্বশুরমশাই বললেন, আপনার এত সুন্দরী মেয়ে, সাজগোজ করবে, ভালো একটা ড্রেসিং টেবিলও তো দরকার!’ নেহাতই অন্য বন্ধু বান্ধবদের থেকে একটু সাজেশন নিচ্ছিল সে, কোন খাট টেকসই, কোন আলমারির দাম রিজনেবল, কিন্তু ভালো, কোন ব্র্যান্ডের ঘড়ি ইন। এগুলোকে কন্যাপণ বলার সাহস কার আছে!

ছোটবেলায় ‘খালি হাতে’ কোথাও যাওয়া বলতে বুঝতাম মিষ্টি নিয়ে না যাওয়া। মান সম্মান বলতে বুঝতাম আত্মমর্যাদা, সাজানো-গোছানো মানে বুঝতাম সুন্দর করে রাখা। কিন্তু বড়ো হতে হতে, মেয়ে হয়ে উঠতে উঠতে ‘খালি হাত’ আর ‘মান সম্মান’ শব্দগুলোর অর্থ কেমন পাল্টে গেল। এখন বুঝি ‘সাজানো গোছানো’ মানে বিয়ের যৌতুক। বাবা-মার ‘মান-সম্মান’ বলতে বুঝি বিয়ের বাজারে মেয়ের দাম আপ টু দ্য মার্ক দিতে পারা বা না-পারা। মজার কথা হল, এগুলো ‘উচ্চশিক্ষিত’, ‘সুবেশা’, ‘শপিংমলবিলাসী’ কন্যারাই মাত্রই বোঝেন, তাঁদের বাবা-মাও বোঝেন।

আর তাই সেই জন্যই মেয়েটি এখন ভাবে, নিজের ঘরটা নিজেদের উপার্জনের টাকায় একটু একটু করে তিলতিল করে সাজাবে, কারও থেকে কিছু না নিয়ে মাটিতে একটা ছোট্ট জাজিম পেতে শোওয়ার বন্দোবস্তটুকু করে নেবে নিজেরাই, খুব স্বাধীন ভাবে থাকবে, তখন হয়তো মেয়েটির থেকে বাবা-মায়েদের সম্মানেই লাগে বেশি। তাঁরা তাই দিতে চান। দেওয়ার কথা বলতে চান, আসলে তাঁরা সব সময়ে ভাবেন, মেয়েকে ‘খালি হাতে’ শ্বশুরবাড়ি পাঠালে কে কী ভাববে! আর মেয়েটি ও হয়তো অন্তরের গভীরে সেই ভাবনাটা ভাবতে শিখে যায়। তাই আর প্রতিবাদ করতে পারে না, চায়ও না আর। হয়তো শুভ-দৃষ্টির সূচনায় টিভি খুললেই দামি দামি ওয়েডিং কালেকশনের স্বপ্নও অবচেতনে তাড়া করে সন্তর্পণে। আর বিয়ে কি এক জীবনে বারবার হয়? একবারই তো! সাধ সাধ্যের বাইরে হলেও, অপূর্ণ রাখলে চলবে কেন?

অতঃপর বিয়ে। একটি মেয়ের জীবনে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইভেন্ট মেগা ইভেন্ট।

সৌজন্যে – এই সময়। ২৮/১২/১৬

তথ্যচিত্রে অমর্ত্য

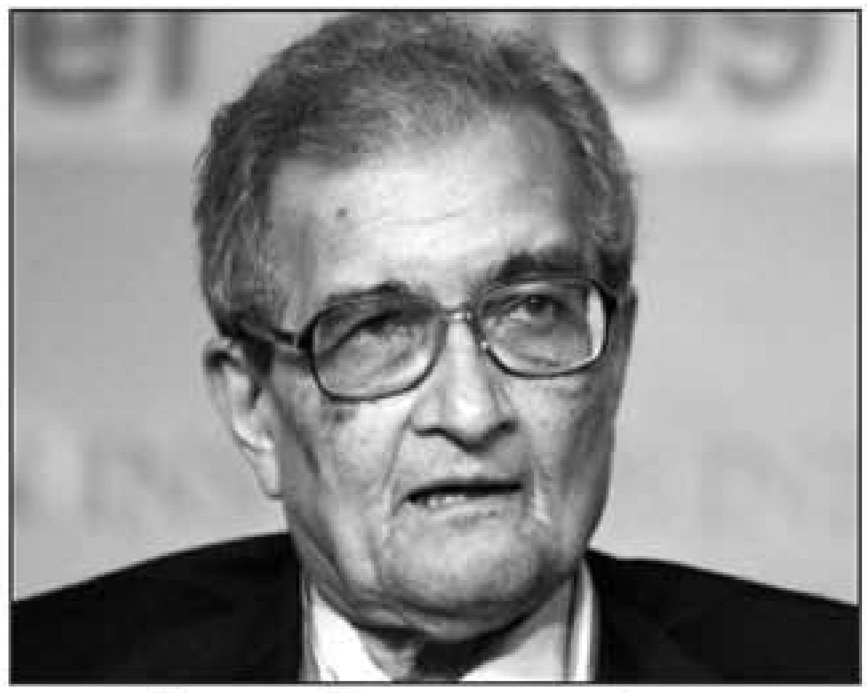

নোবেলজয়ী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে নিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাণ শুরু হয়েছে। তথ্যচিত্রটি পরিচালনা করছেন সুমন ঘোষ। শান্তিনিকেতনের পাঠভবন, প্রতীচী ট্রাস্টের পাশাপাশি শুটিং হবে কলকাতায়। এছাড়াও বিদেশে যেখানে যেখানে অমর্ত্য সেন কাজ করেছেন, সেখানেও তথ্যচিত্রটির শুটিং হবে বলে জানা গেছে। অমর্ত্য সেনের জন্ম অবিভক্ত ভারতের মানিকগঞ্জে (যা এখন বাংলাদেশে)। প্রথম জীবনে তাঁর পড়াশোনা ঢাকায়। পরে শান্তিনিকেতনে পাঠভবনের পাশাপাশি তিনি পড়াশোনা করেছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। প্রথম জীবনে অধ্যাপনা শুরু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। অর্থনীতিতে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পান। পরের কর্ম ভারতরত্ন। অর্থনীতির ওপর তাঁর লেখা শতাধিক বই রয়েছে। তাঁর লেখা সাম্প্রতিক বই ‘দ্য কান্ট্রি অফ ফার্স্ট বয়েজ’। জানা গেছে, অমর্ত্য সেনের জীবনে নানা জানা-অজানা ঘটনার কথা থাকছে সুমন ঘোষের এই তথ্যচিত্রটিতে। থাকবে স্কুলজীবন থেকে তাঁর নোবেলজয়ী হয়ে ওঠার কথা।

সৌজন্যে – আজকাল

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL EXECUTIVE COMMITTEE

President
Milan Awon

President Elect
Dilip Chakrabarti

Vice-Presidents
Debi Prosad Palit
Tapas Sanyal

Treasurer
Ranadeb Sarkar

Secretary
Arunava Sinha

Assistant Secretary
Dhriti Bagchi

Members
Sugata Bagchi
Adris Chakraborty

BOARD OF TRUSTEES

Chairman
Kajal sarkar

Members
Chitta Saha
Pranab Das
Arun Bhattacharya
Asok Motayed
Samprakash Majumdar
Purna Bhattacharya
Kumar Sankar Mandal
Asoke Dey Sarkar

‘সেরার সেরা’ মর্জিনা বিবি, বলছে প্রশাসন

দয়াল সেনগুপ্ত, দুবরাজপুর

‘সেরার সেরা’-র পুরস্কার হাতে নিয়ে তিনি বলছেন, কাজটা মোটেও সহজ ছিল না।

মর্জিনা বিবির জীবন-কাহিনীর দিকে তাকালে বোঝা যাবে, কাজটা কেন সহজ ছিল না। কতটাই বা কঠিন ছিল সেরা হওয়ার সেই পথ।

পনেরো হতে না হতেই বিয়ে। তার পরেই তিন সন্তান। মাত্র কুড়িতেই বিধবা। পরের দয়ায় পেট চালাতে চালাতে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিল তাঁর। এক শিক্ষকের পরামর্শে নাম লেখান স্বনির্ভর দলে। সেটা ২০০৩। ধীরে ধীরে মহাসঙ্ঘের অধিকর্তী পদে উত্তরণ। দশ বছর পরে সেই মর্জিনার নেতৃত্বেই দেশের সেরা মহাসঙ্ঘের পুরস্কার ছিনিয়ে নিল বীরভূমের ‘আত্মসম্মান সঙ্ঘ’।

ঘটনাও। আত্মসম্মান কাকে বলে, সঙ্ঘের অধীনে থাকা দুশোরও বেশি স্বনির্ভর দলের মহিলাদের তা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে হাতে ধরে বুঝিয়েছেন দুবরাজপুরের সাহাপুর গ্রামের মর্জিনা। ২৩ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অনুষ্ঠানে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাত থেকে মর্জিনা বিবি এবং সঙ্ঘের সম্পাদিকা কুলসুম বিবি পুরস্কার নিয়ে এসেছেন। দেশের সমস্ত মহাসঙ্ঘের মধ্যে বাছাই করা ১০টি মহাসঙ্ঘকে পুরস্কৃত করেছে মন্ত্রক। কিন্তু, সেরার সেরা ‘আত্মসম্মান’।

এলাকার ৮-১০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী নিয়ে তৈরি হয় উপসঙ্ঘ। এমন ১০-১২ টি উপসঙ্ঘ নিয়ে তৈরি হয় মহাসঙ্ঘ। সেই মহাসঙ্ঘের মাধ্যমেই পরিচালিত হয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড।

দেশজুড়ে থাকা অসংখ্য মহাসঙ্ঘের মধ্যে সঞ্চয়, ঋণ প্রদান ও শোধের হার, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি-সহ নানা কাজের মাপকাঠির নিরিখে সেরা হয়েছে ‘আত্মসম্মান’। দুবরাজপুর ব্লকে মহিলা উন্নয়ন আধিকারিক মিতালি দাসরায়, মিশনের ব্লক প্রকল্প আধিকারিক মিতালি দাসরায়, মিশনের ব্লক প্রকল্প আধিকারিক সোমেন দত্তজানালেন, শুধু নির্মল বাংলা মিশনেই ৭০ লক্ষ টাকার শৌচাগার গড়েছে ওই মহাসঙ্ঘ। এ ছাড়া সামাজিক বনসৃজন থেকে বিভিন্ন সচেতনতা মূলক প্রচারেও এগিয়ে ওই সঙ্ঘ। দুবরাজপুরের বিডিও বনমালী রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তনুশ্রী ঘোষরা মানছেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে যে মানদণ্ডে সঙ্ঘের কাজ যাচাই করেছে, তার সব ক’টিতেই এগিয়ে ছিল আত্মসম্মান। এর নেপথ্যে রয়েছেন মর্জিনা এবং তাঁর হার না মানা লড়াই।

কেমন ছিল সে লড়াই?

মর্জিনা জানাচ্ছেন, স্বামীর মৃত্যুর পরে তিন সন্তান নিয়ে পথে বসেছিলেন। পাড়াপড়শির দানে পেট চলত। ভেবেছিলেন, স্কুলে মিড-ডে মিল রান্না করে সন্তানদের মুখে দু’মুঠো খাবার দেওয়া যায়। স্বনির্ভর দলে যোগ দেওয়ার পরে জীবন বদলাতে থাকে। মর্জিনার কথায়, ‘‘প্রত্যন্ত গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিধবা হয়ে সেই সময়ে দল করার কাজটা সহজ ছিল না। পথে ঘোরাতে জুটেছে নানা বিদ্রুপ।’’ কিন্তু, দমেননি। শিখেছেন নাবার্ড আয়োজিত জাঁতা শিল্পের কাজ। পরে সেই কাজই তিনি দলের অন্য মহিলাদের শেখান। আরও স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়তে উদ্বুদ্ধ করেন। ধাপে ধাপে মহাসঙ্ঘের সম্পাদিকা, বর্তমানে অধিকর্তী (ডিরেক্টর)। এখন তাঁর মহাসঙ্ঘের আওতায় ২২০টি স্বনির্ভর দল।

৩৫-এ পা দেওয়া মর্জিনার লড়াই থামেনি এখানেই। সমাজের বাঁকা চোখ উপেক্ষা করে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা যুবক জহিরউদ্দিন শেখকে বিয়ে করেছেন মর্জিনা। ক্লাস এইটে স্কুল ছাড়া মেয়ে এখন উচ্চ মাধ্যমিকের প্রস্তুতিতেও মগ্ন। মর্জিনা বলছেন, ‘‘সম্মান পেয়ে ভাল লাগছে। তবে, ব্লক প্রশাসন এবং আরও অনেকের সহযোগিতা না পেলে এখানে পৌঁছতে পারতাম না।’’ যাঁর পরামর্শে তাঁর জীবন বদলেছে, সেই সাহাপুর গ্রামের স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শেখ সবের আলির কথায়, ‘‘মেয়েরাও যে চেষ্টা করলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, সে কথাটাই ওকে ডেকে এক দিন বুঝিয়েছিলাম। আজ ওর জন্য গর্ব হচ্ছে। ওকে দেখে বাকিরাও শিখুক।’’

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২৫/১২/১৬)

Kolkata/Jodhpur Park

1100+ sq ft.
3 bed, 2 bath, 2 balcony
First floor, pond facing (east)
1 garage.(Deeded)
PRICE - NEGOTIABLE
Email: sandhya.shah3@gmail.com

এ যেন যুধিষ্ঠিরের ধর্ম-কুকুর, নবীনের সঙ্গে ৬০০ কিমি পাড়ি রাস্তার মালুরও

কুরুক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব যখন মহাপ্রস্থানের পথে রওনা হলেন, তখন তাঁদের মহাপ্রস্থানের পথে রওনা হলেন, তখন তাঁদের সঙ্গী হয়েছিল একটি কালো কুকুর। একে একে দ্রৌপদী, চার কনিষ্ঠ পাণ্ডবের মৃত্যুর পরেও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গ ছাড়েনি সেই অবোলা বন্ধু!

আশ্চর্যের শেষ অবশ্য এখানেই। কারণ, এরপরেই জানা যায়, আসলে সে কুকুর নয়, ধর্মরাজ। আর দেবতারা যে ছলনায় ভক্তদের পরীক্ষা নেন, সে আর কে না জানে!

কেরালায় সম্প্রতি যে ঘটনাটা ঘটেছে তার মধ্যে কিন্তু এমন অধিদৈবিক ব্যাপার স্যাপার নেই মোটে। এ গল্পের নায়িকা এক নির্ভেজাল পথকুকুর। যেচে পাতানো বন্ধুত্বের টানে যে পাড়ি দিয়েছে ছ'শো কিলোমিটার উপর।

যে রাজ্যে পথকুকুরদের প্রতি নৃশংসতার ঘটনা দেশের শীর্ষ আদালতকে পর্যন্ত নড়েচড়ে বসতে বাধ্য করেছে, 'নেড়ি'-হত্যা যেখানে আর কোনও খবরই নয়, সেই কেরালায় ৩৮ বছরের নবীন আর পথকুকুর মালুর বন্ধুত্বের গল্প যেন অবিশ্বাস্য এক কিংবদন্তি।

মন ভালো করে দেওয়া এই গল্পটার শুরু ডিসেম্বরের ৮ তারিখ। সে দিনই মালুর সঙ্গে প্রথম দেখা মন্দির যাত্রায় বেরনো নবীনের। শুরুতে অবশ্য বন্ধুকে ঠিক চিনতে পারেননি কোঝিকোড়ের ওই তরুণ।

কেরালা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মী নবীন তার আগের দিনই উদ্দপির কোল্লুরে মুকাম্বিকা মন্দির থেকে শবরীমালা মন্দিরের উদ্দেশে পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সঙ্গে ছিল বিরুমুদিকেট্টু (পুজোর সব সামগ্রী ও সরঞ্জাম-সহ একটি বস্তা) আর একটা ঝোলায় নিজের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র। অনেক দূরের পথ, তাই রাত বাকি থাকতেই বেরিয়ে পড়তে হত। আর সে সময় রাস্তার কুকুর এসে ঘিরে ধরছে বা ঘেউ-ঘেউ চিৎকার করছে, এমন অভিজ্ঞতা বেশ কয়েকবার হয়েছিল। একলা পথিক আর কী করবে। হাটি হাটি করে তাড়িয়ে দিয়ে তার মধ্যেই পথ চলছিলেন।

এ রকম করে যাত্রাপথের প্রথম ৮০ কিলোমিটার যখন পেরিয়ে গিয়েছেন, তখনই নায়িকার প্রবেশ। নবীনের কথায়, 'আমি এগোচ্ছি, দেখি, উল্টো দিক থেকে রাস্তার একটা কুকুর আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। ঠিক সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর জুলজুল করে চেয়ে রইল আমার দিকে। যতই হাটি হাটি করি সে আর কিছুতেই যায় না।'

যাক, কোনও উৎপাত যখন করছে না, তখন চলাই যাক। এই ভেবে তার দিকে না তাকিয়েই চলতে শুরু করে নবীন। মালু কিন্তু সঙ্গ ছাড়ে না। কিছুদূর করে এগিয়ে যায়, আর পিছন ফিরে দেখে, নবীন আসছেন কি না। প্রথম দিকে নাকি মিটার কুড়ির একটা দূরত্ব রেখে চলত। কিন্তু কয়েক দিন পর থেকে শুরু হল নবীনের পায়ে পায়ে পথ চলা। কখনও তাঁর পাশে, কখনও ঠিক পিছনে। ততদিনে কোঝিকোড়ের সীমানা পেরিয়ে গিয়েছেন নবীন, এবং বুঝে গিয়েছেন, মালু আর তাঁকে ছেড়ে যাবে না। আর হলও ঠিক তাই। টানা ১৭ দিন ধরে সে-ই নবীনের সারা দিনরাতের সঙ্গী।

এই অবাক সফরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নবীনের গলায় ঝরে পড়ে অকৃত্রিম স্নেহ। 'ও খুব বুদ্ধিমান কুকুর। যখন আমি স্নান-খাওয়া করতাম, ধৈর্য ধরে আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকত। রাতে আমার জিনিসপত্র পাহারা দিত, আমারা ঘর পাশেই শুয়ে ঘুমোত। এমনকি ওই ছিল আমার অ্যালার্ম। রাত তিনটের সময় উঠতে হত। তার আগেই নাক দিয়ে গুঁতো মেরে আর ডেকে ও আমায় তুলে দিত।'

শবরীমালায় পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার পথেও পিছু পিছু ফিরেছে সে। এরপর কি আর তাকে দূরে রাখা যায়। ২৩ ডিসেম্বর নবীন বাড়ি ফেরার পরে থেকে মালু তাই তাঁর পরিবারেরই একজন। নাম রাখা হয়েছে মালিকাপ্পুরম। শবরীমালা মন্দিরের মহিলা ভক্তদের যে নামে ডাকা হয়। মুখে মুখে সেটাই ছোট করে মালু। নবীনের বাড়িতে দিব্যি আদরে রয়েছে সে। তাদের অসামান্য বন্ধুত্বের সাক্ষী দিচ্ছে গলায় জড়ানো নবীনের দেওয়া রুদ্রাক্ষ পুঁতির মালা। যে উপহার নিয়ে গর্বের অন্ত নেই মালুর!

সৌজন্যে – এই সময় ৩০/১২/১৬

স্বজন হারানোর বিচার কবে, পথে ওঁরা

পথ হাঁটছেন একাশি বছরের বৃদ্ধ। দড়িতে বেঁধে গলায় ঝুলছে প্রয়াত বড় ছেলের ছবি। পাশেই বিমানবন্দরের ১ নম্বর গেটের বাসিন্দা এক প্রৌঢ়ার হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডে তাঁর একমাত্র মেয়ে তনুশ্রীর ছবি। মাস কয়েক আগেই সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হাতের মুঠোয় মৃত্যু স্ত্রীর ছবি আঁকড়ে মেট্রোপলিটানের বাসিন্দা এক যুবক। পাশাপাশি এঁদের মতোই আরও অনেকে।

ওঁরা প্রত্যেকেই প্রিয়জনকে হারিয়েছেন এবং অভিযোগ তুলছেন চিকিৎসায় গাফিলতির। বিচার চেয়ে মেডিক্যাল কাউন্সিল বা ক্রেতাসুরক্ষা আদালতে ধর্না দেওয়া চলেছে। কেউ সুবিচারের অপেক্ষায় রয়েছেন তিন বছর, কারও আবার দিন গুনতে গুনতে তেরো বছর পার। কলকাতায় ওঁরাই একসঙ্গে পথে নামলেন বিচারের দাবিতে। প্রশ্ন তুললেন – বিচার প্রক্রিয়ায় এত দীর্ঘসূত্রতা কেন? কেন বছরের পর বছর অভিযোগ পড়ে থাকে মেডিক্যাল কাউন্সিলের কাছে, শুনানিই হয় না? কেনই বা চিকিৎসায় গাফিলতির মামলা করার জন্য অভিযুক্ত হাসপাতাল থেকে কাগজপত্র বার করতে জেরবার হতে হবে? কেন থাকবে না সরল কোনও ব্যবস্থা? কেন থাকবে না ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মতো কোনও উপায়?

গত বছরে ৩০ জুলাই আচমকা কোমর ও পায়ে যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল বছর বত্রিশের অনিন্দিতা ভট্টাচার্যের। বাইপাসের ধারের এক হাসপাতালে ভর্তির পর ১ অগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়। স্বামী শিবাজির অভিযোগ, "সমস্যাটা যে কিডনিতে ছিল, সেটা বুঝতেই সময় নিয়ে নিলেন চিকিৎসকেরা। কখনও স্নায়ুর, কখনও হাড়ের চিকিৎসা করলেন। আর তাতেই আমার ২ বছর ও ৯ বছরের দুই মেয়ে এনিকা আর উরভির মা হারিয়ে গেল চিরকালের মতো।"

মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের ব্যবসায়ী একাশি বছরের হেদিলাল পোদ্দারের বড় ছেলে ৫১ বছরের সঞ্জয় পোদ্দার মারা গিয়েছেন গতবছর ৭ সেপ্টেম্বর। হেদিলালের অভিযোগ, হিমোগ্লোবিন সাড়ে ৫ এবং প্লেটলেট ২১ হাজার থাকা সত্ত্বেও মধ্য কলকাতার এক নার্সিংহোম তাঁর ছেলের বুকে স্টেন্ট বসিয়েছিল। ৫৫ দিন আইসিইউয়ে থাকার পরে সঞ্জয়ের মৃত্যু হয়।

ভিড়ের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন বাগুইআটির অ্যাভিনিউয়ের বাসিন্দা সত্তরোর্ধ্ব সুব্রত দস্তচৌধুরী। ছেলে তীর্থঙ্কর দস্তচৌধুরী মারা গিয়েছেন ২০১১ সালের ৮ মে। সুব্রতবাবুর অভিযোগ, তীর্থঙ্করের কিডনি ক্যানসার হয়েছে বুঝতেই ডাক্তারেরা দু'মাস সময় নিয়ে নেন। তাতে রোগ বেড়ে যায়। মারা যান ৩১ বছরের তীর্থঙ্কর। রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলে পাঁচ বছর মামলা চলার পরে গতবছর ২৩ ডিসেম্বর প্রথম বার কাউন্সিলের সামনে ডাক পেয়েছিলেন সুব্রতবাবু। হাঁটিতে-হাঁটিতেই হতাশ গলায় বললেন, "এই যদি বিচারের গতি হয়, তা হলে ধরে নিতে হবে আমাদের মতো মানুষদের সামনেটা পুরোটাই অন্ধকার।"

ভাবা জরুরি, সহপাঠিনী কেন 'শরীর' হয়ে উঠছে

সম্প্রতি ধর্ষকের তালিকায় উঠে এল কিশোর সহপাঠীরাও। যার সঙ্গে কৈশোরের প্রতি মুহূর্তে বেড়ে ওঠা, সে-ও শুধু শরীর এখন? লিখছেন বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

পরিস্থিতি এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে সকালে খবরের কাগজে যদি কোনও 'ধর্ষণ'-এর, নিদেনপক্ষে দেহি লাঞ্ছনার ঘটনার কথা না থাকে, তা হলেই আশ্চর্য হব।

'কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ' -এর পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৪ পর্যন্ত প্রতি ৩০ মিনিটে ১টি 'ধর্ষণ'-এর ঘটনা নথিভুক্ত হয়। এ তো হবিভুক্তির হিসেব। এর-বাইরে যে অগণিত ঘটনা আছে, এ আমরা সবাই জানি। এই নথিভুক্ত ঘটনার যে সামান্য ক'টি 'খবর' হয়ে ওঠার কৌলিন্য লাভ করে, তা, বোধ হয় ঘটে যাওয়া ঘটনার শতাংশের হিসেবেও আসে না। আর তাতেই আমাদের ঘুম ছুটে যাবার অবস্থা।

এরই মধ্যে কিছু ঘটনা থাকে, যা সাধারণ ধর্ষণের ধারণাকে ছাড়িয়ে একেবারে হাড় হিম করে দেয়। যেমন দিল্লি বা কামদুনির ঘটনা। এতটাই নৃশংসতা সামনে এসেছিল যে নাগরিক সমাজও প্রতিবাদে রাস্তায় না নেমে বাধ্য হয়েছিল। আর হয়তো সেই চাপের মুখেই প্রশাসন বাধ্য হয়েছিল ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট-এ বিচার করতে। অধিকাংশ মামলাই কোর্টের আঠারো মাসে বছরের চক্রে পড়ে স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়। কাগজের ভেতরের পাতাতেও তার আর ঠাঁই হয় না। তত দিনে অন্য খবরের রোমহর্ষক শিহরণ জাগানোর দায়িত্বে এসে যায়। আমরা সেই আক্রান্ত মেয়েটি কী কী অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেল, আদৌ মানসিক ভাবে সুস্থ থাকতে পারল কিনা সে সব জানা প্রয়োজন আছে বলেও আমরা মনে করি না। আর অপরাধী জামিনে ছাড়া পেয়ে গেল, তার আর কীই বা আসে যায় 'কেস' কোর্টে উঠল কী না, তা জেনে। সে আবারও হয়তো আর একটি ধর্ষণের জন্য প্রস্তুতি নেয়, এই বাস্তবতা আমরা মেনে নিয়েছি। এ ভাবেই চলবে। মিটিং, মিছিল, স্মারকলিপি দেওয়া হবে। আবার ধর্ষণও হবে। সমাজকে ঘাড় ধরে পিতৃতন্ত্র এই বাস্তবতাকে মান্যতা দিতে বাধ্য করেছে। এই সহাবস্থানকে আমরা নিয়তিবাদী ভারতবাসী ভাগ্যের দোহাই দিয়ে মেনে নিয়েছি।

এই রকম একটা পরিস্থিতিতে সাম্প্রতিক একটি খবর আমাকে আমূল নাড়িয়ে দিয়ে গেল। সেই সঙ্গে আগামী দিনের একটা ইঙ্গিতও বোধ হয় রেখে গেল। এই কিশোরীকে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বোতলাল পার্টি বলাই রীতি। আর সহপাঠীরা ধর্ষণ করেছে। খবরের দুনিয়ায় খবরের গুরুত্ব যাঁরা স্থির করেন, তাঁরা যে, খবরটিকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন, এমনটি নয়। আমি কেঁপে উঠলাম এই ভেবে যে, শেষ পর্যন্ত সহপাঠীরাও? বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে নানা ভাবে নানা সম্পর্কের মোড়ক ভেদ করে পরিবারের মধ্যে মেয়েদের যৌন লাঞ্ছনার ঘটনা সামনে এসেছে। তা হলে সহপাঠীরাই বা কী দোষ করল? পরমুহূর্তে এ প্রশ্নও মনে এল। আসলে, সহপাঠী বলতেই আমার মনে আমার কিশোরবেলায় সহপাঠীদের নতুন নতুন দাড়ি-গোঁফ সাজানো কোমল মুখগুলিই মনে পড়ে। কালের নিয়মে সেই সব মুখ ভেঙেচুরে বুড়োটে হয়ে গেছে কিন্তু আমার মনে তো তাদের বয়স আর বাড়েনি। সেই কলেজের প্রথম বর্ষে দেখাতেই স্থির হয়ে আছে। সেই সব মুখের সঙ্গে 'ধর্ষণ', 'যৌন-লাঞ্ছনা' এই সব কুৎসিত শব্দাবলী এতটাই বেমানান যে, আমার সুদূর কল্পনাতেও আসে না যে, ওই বয়সের একটি ছেলে তারই পাশে বসে মেয়েটি রোজ – তাকে কোনও ভাবে হেনস্থা করতে পারে। প্রেমে পড়তে পারে, হিংসে করতে পারে, প্রতিযোগী মনে করতে পারে। কিন্তু 'ধর্ষণ'?

আমার মায়েরা যখন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের সঙ্গে পড়তে গিয়েছেন, তখন তাঁর পাশাপাশি বসতেন না। আলাদা আসন ছিল। সেই অচ্ছুৎ ভাব কেটে গেছে আমাদের সময়ে। কিন্তু সেটিও পাল্টে গিয়ে বন্ধুত্বের কখন খাদ্য-খাদকে পরিণত হল জানতে পারিনি তো আমার প্রজন্মের ছেলেদের মন, মানসিকতা জেনেছি সহপাঠীদের সঙ্গে আড্ডা মেরে। এই মেয়েটি কি জানতে পেরেছিল তার ধর্ষণকারী সহপাঠীদের মনে তাকে নিয়ে কী চিন্তা চলছিল? আমাদের সময়েও উত্যক্ত করার লোকের অভাব ছিল না। রাস্তায় বাসে-ট্রামে, সিনেমা হলে, এমনকী কফি হাউসেও একলা বা শুধু মেয়েরা থাকলে বহু ছেলেই হঠাৎ 'পুরুষ' হয়ে উঠতে চাইত। অস্বস্তিকর দৃষ্টিতে আমরা গুটিয়ে যেতাম, সন্দেহ নেই। কিন্তু কখনও সহপাঠীদের সঙ্গে এমন অনুভব তো মনে পড়ে না। ওরা তো ছিল আমাদেরই আর একটু প্রসারিত 'আমাদের'। এই বন্ধুত্বটাও চলে গেলে, মেয়েরাই বা বাঁচবে কী করে? ছেলেদের অবস্থা তো কল্পনাতীত।

অনেকেই মনে করে কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি হলেই বুঝি এই মানসিকতাই অবসান ঘটবে। তা যে ঘটবে না, ধনঞ্জয়ের ফাঁসি থেকে যাবজ্জীবনের লম্বা লিস্ট প্রমাণ করে একজন শাস্তি পেলে, সেই মুহূর্ত থেকে দশজন রক্তবীজের মতো তৈরি হতে থাকে। তার মানে এই নয় শাস্তি হবে না। শাস্তি হবে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়।

বস্তুত নতুন করে আবার সময়ের চাকা উল্টো বাগে ঘুরিয়ে দিয়ে মেয়েরা অচ্ছুৎ হয়ে যেতে পারবে না। এই পৃথিবীর আলো হাওয়ার মতো, রাস্তা-ঘাট স্কুল-কলেজ, অফিস কাছারি থেকে শোবার ঘর, বসার ঘর, রান্নাঘর— সর্বত্রই নারী পুরুষ পাশাপাশি থাকবে। সেটাই দস্তুর। আর সেই দস্তুরেই মঙ্গল। তাই পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক যদি খাদ্য-খাদকের হয়ে ওঠে, তা হলে আর যাই হোক, সহাবস্থান সম্ভব নয়।

মোমবাতি মিছিল বা কড়া আইনি শাস্তি যাই হোক না কেন, মূল সমস্যার যে কেশাগ্র স্পর্শ করা হয়নি, এটা এ বার মেনে নেবার সময় এসে গেছে। এ বার প্রতিরোধ ভিতর থেকে তৈরি হওয়াটা জরুরি হয়ে উঠেছে। কেবল মেয়েদের নিরাপত্তার প্রশ্ন নয়, ভেবে দেখা জরুরি হয়ে পড়েছে যে কেন আমাদের ছোটো ছোটো কিশোরদের কাছে 'বড়ো' হয়ে ওঠার 'ক্ষমতাশালী' হয়ে ওঠার সমার্থক হয়ে দাঁড়াচ্ছে সহপাঠীকে ধর্ষণ? প্রতি দিন যার সঙ্গে একটু একটু করে বেড়ে ওঠা, সে কবে শুধু 'শরীর' হয়ে ওঠে? আর এই সব প্রশ্নের সমাধান খোঁজা শুরু হোক এখনই। মেয়েদের সংগঠন বা প্রত্যেক ক্ষেত্রে একলা একটি মেয়ে এ বার রুখে 'নারীর ব্যক্তিগত পরিসর পণ্য করতে দেব না।' হোর্ডিং, পোস্টার আর চ্যানেলে চ্যানেলে অনাবশ্যক নারী শরীর দেখব না। আইন হোক। না মানলে, দণ্ড দেওয়া হোক।

আর এই প্রথম আওয়াজটা উঠুক মেয়েদের জন্যে।

সৌজন্যে – এই সময় ৩০/১২/১৬

চৈতন্যের বোধনে ও সর্বধর্মের মিলনে 'কল্পতরু' ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

বিশেষ নিবন্ধ

হরপ্রসাদ সেনশর্মা

'তোমার পরশ আসে কখন কে জানে...'

১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি। কাশীপুর উদ্যানবাটিতে হাজার হাজার ভক্তের উপস্থিতিতে 'কৃপা-কল্পতরু' হয়ে ঠাকুর তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ করেছিলেন। চৈতন্যের বোধনে উদ্দীপ্ত হয়ে ঠাকুর সেদিন কৃপা করেছিলেন—নাট্যকার গিরিশ ঘোষ, নটি বিনোদিনী, রসিক মেথর, ধনী কাঙালিনী, রামলাল, হরিশ মুখার্জি, বৈকুণ্ঠ সান্যাল, ভূপতি রাজকৃষ্ণ, নবগোপাল ঘোষ, অক্ষয়কুমার সেন এবং আরও অনেক অনেক ভক্তকে। আর তাঁর প্রিয়তম ভক্ত নরেনকে দিয়েছিলেন 'ঈশ্বরের দরবারের চাবি', আখ্যা দিয়েছিলেন 'নররূপী নারায়ণ' বলে। লেখক 'শঙ্কর' এই প্রসঙ্গে বলেছেন—'কল্পতরু হয়ে সাধ-আহ্লাদ তিনি কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে একদিন মাত্র পূর্ণ করেননি; মানুষকে চিরদিনের কল্পতরু লাভের গোপন রহস্যটি সোজাসুজি বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

আর প্রতিদিনের জীবনে ঠাকুরের কৃপায় যাঁরা ধন্য হয়েছিলেন, সমৃদ্ধিলাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে—গৃহীভক্ত গরিব উপেন মুখোপাধ্যায় দৈনিক সংবাদপত্র বিক্রি করতেন। পরবর্তী সময়ে ঠাকুরের কৃপালাভে তাঁর ভাগ্য যে কতটা প্রসন্ন হয়েছিল বউবাজারের মোড়ে 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' তার সাক্ষ্য বহন করছে)। অতুল ঘোষ (গিরিশ ঘোষের ভাই, যিনি ঠাকুরকে প্রথমে উপহাস করেছিলেন, পরে ঠাকুরের মধ্যে অর্ধেক শিব ও অর্ধেক কালীরূপ দর্শন করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন)। অঘোরমণি দেবী (গোপালের সেবায় যাঁর একনিষ্ঠতা দেখে ঠাকুর তাঁর নামকরণ করেছিলেন—'গোপালের মা'), এছাড়া বিখ্যাত বিদেশি শিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাকের ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন। বিখ্যাত ফরাসি লেখক রোমাঁ রোলাঁর ইচ্ছা ছিল ঠাকুরের জীবনী লিখবেন। ঠাকুরের কৃপায় তিনি তা সম্পূর্ণ করেন।

সেই অনুপম গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় ঋষি দাস। এ ছাড়াও যাঁরা তাঁর কৃপালাভে ধন্য হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে যীশু, রানি রাসমণি, মথুর এবং আরও অনেকেই উল্লেখযোগ্য।

'কল্পতরু' উৎসবের দিনে দক্ষিণেশ্বর কুঠিবাড়ির উপর থেকে সবাইকে উদ্দেশ্য করে ঠাকুর বলেছিলেন—'ওরে তোরা কে, কোথায় আছিস, আয়!' ঠাকুর মা'র কাছে গদগদ স্বরে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা করছেন। 'কি আশ্চর্য! ভক্তের জন্যে মা'র কাছে কাঁদছেন আর বলছেন—মা, যারা যারা তোমার কাছে আসছে, তাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর। কালী-কল্পতরুর প্রতিভূ শ্রীরামকৃষ্ণ তাই করলেন মায়ের দিকে থেকে। কারণ মা-ই সব হয়ে রয়েছেন কিনা।'

ভক্তজনের প্রতি ঠাকুরের এই করুণার কথা শুনতে শুনতে আমার কেবলই মনে হয়—'প্রেমময়ে যদি আমি নিজের মধ্যে ব্যক্তি করতে পারিতবেই তো তোমাকে আমার লাভ করা হল। তুমি যে কল্পনার নাও, তাই আমি প্রমাণ করব আমার মধ্যে তোমাকে বাস্তব সত্যের পরিণত করে। কিন্তু কি করে তোমাকে প্রকাশিত করি? তোমাকে প্রকাশিত করার আমার একটিমাত্র উপায় আছে। সে হল আমার কর্ম। আমার কর্ম, কর্মের জন্য নয়। তোমাকে প্রকাশিত করবার জন্যে। কর্মেই কর্মের শেষ নয়, কর্মের শেষ হচ্ছে হওয়া। করতে করতে একদিন হয়ে উঠব আমি তোমার জ্বালাতে-জ্বালাতে হয়ে উঠব তোমার দেবমন্দিরের প্রদীপ। প্রত্যেকের মনের বীণায় সুর তুলতে তুলতে হয়ে উঠব তোমারই মনোবীণা।'

ঠাকুর ভাবতেন চেতনার বোধনই সবচেয়ে বড় কথা। কল্পতরু হওয়ার আগে এবং পরের দিনগুলিতে তিনি চেতনার জাগরণে সর্বদা সতর্ক থেকেছেন তাই আশীর্বাদ, আদেশ, অভিমত কিংবা প্রয়োজনে পরামর্শ দিতে গিয়ে সব সময় বলেছেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক।' তিনি বলতেন—চৈতন্য যদি একবার হয়, যদি একবার কেউ ঈশ্বরকে জানতে পারে, তা হলে ওসব হাবজা-গাবজা জিনিস জানতে ইচ্ছে হয় না।'

স্বামী সারদানন্দ কল্পতরুর দিনে চৈতন্য জাগরণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'ঈশ্বর কল্পতরু' এই কথা ঠাকুর ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জুন, পণ্ডিত শশধরকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলেছিলেন। কাশীপুর উদ্যানবাটি ঘটনায় তা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ হলো—তিনি স্বয়ং ঈশ্বর ও ব্রহ্ম কল্পতরু।' ঠাকুর বুঝেছিলেন—'জাগতিক আলোয় হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয় না, চাই জ্ঞানের আলো। আলোর দিশারী শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং কলকাতার বুকে এসে জীবোদ্ধারের কাজটি করেছিলেন। বহির্মুখী মনে মোড় ফিরিয়ে দিয়ে অন্তর্মুখী মনকে—ঈশ্বরাভিমুখী করেছিলেন। চৈতন্য করুণা কণায় নিমেষে আলোকিত হলো জীবের অন্তঃকরণ! ...তিনি সকলকে পূর্ণত্বে নিয়ে যাবার জন্য যা প্রয়োজন তাই দিয়ে দিয়েছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপার বিদ্যুৎ প্রকাশ কিন্তু ওই দিনেই (১ জানুয়ারি) শেষ হয়ে যায়নি, তাঁর আশীর্বাদ মানুষের মঙ্গল কামনায় সতত বহমান। তাই তো যাঁরা সেদিন এসেছিলেন, কিংবা আসতে পারেননি তাঁদের সকলের উদ্দেশেই ঠাকুর অনায়াসে বলেছিলেন—'তোমার চৈতন্য হউক।' শুভ কল্পতরু উৎসবের দিনে আমিও তাঁর কৃপা প্রার্থনা করে বলি—'তোমার কাছে আরো পাব এই তো আমার প্রার্থনা নয়। তোমার কাছে যা পেয়েছি তাই তো অপার অন্তহীন। তবু আরো যদি কিছু চাই সে তোমাকে, তোমার হাতের পারিতোষিকে নয়। কর্ণধারকে, না কোন সম্ভার ভরা তরণী। নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে চাই তোমার সঙ্গে মগ্নতরঙ্গের দোলাতে। তোমাকে যদি আরো চাই, তার মানে একলা মনের অন্ধকারে চাই না, চাই জগোদ্ভাসক সূর্যের আলোতে, বিশ্বব্যাপী জীবের জনতায়।'

'ঐক্যং সুদর্শি তত্ত্বা পরমং স্তুহবয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবন্ তব সুপ্রভাতম্।" শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ধর্মমত-সহিষ্ণুতা ছিল গীতার ভাবনা থেকেও উদারতর। সর্বধর্ম মিলনের বাণী ঘোষণা করে ঠাকুর বলেছিলেন—'আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল—এ মত ভাল নয়। ঈশ্বর এক—এক বই দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে লোকে ডাকে। কেউ বলে গড়, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম, যেমন পুকুরে জল আছে—এক ঘাটের লোক বলছে পানি, এক ঘাটের লোক বলছে জল, আর এক ঘাটের লোক বলছে ওয়াটার—কিন্তু বস্তু এক। মত-পথ, এক-একটি ধর্মের মত এক একটি পথ—ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। যেমন, নদী নানা দিক থেকে এসে সাগর সঙ্গমে মিলিত হয়।' নদী আর সাগরের উপমাটিও ধর্ম বৈচিত্র্য ও ঈশ্বর সম্বন্ধে শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। অচিন্ত্য কুমারের লেখনীতে আরও সুন্দরভাবে তা পরিব্যক্ত হয়েছে। 'বিচিত্ররূপকে বিবিধভাবে আস্বাদ। যে ভাবেই যাহা গ্রাহ্য করো সর্বত্রই সেই অমোঘ আমিই আমি সাকারে আছি, নিরাকারে আছি, মন্দিরে আছি, মসজিদে আছি, গির্জায় আছি, গুরুদ্বারে আছি। আবার আছি এই মুক্ত আকাশের অঙ্গনে। আমারহৃদয়ের নিভৃতে। সব পথই পথ। কিন্তু পথটাই ঈশ্বর নয়। আসল হচ্ছে আন্তরিকতা। পথে রথে এক হওয়া। যদি 'যাব' এক বাণীটি সত্যিই ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তবে পথই ঠিক টেনে নিয়ে যাবে। অন্তর যদি সরল হয়। ভুল পথও সোজা হয়ে উঠবে। যদি কেউ আন্তরিক জগন্নাথ দর্শনে বেরয়, আর ভুলে দক্ষিণ দিকে না গিয়ে উত্তর দিকে যায় তা হলে, বলতেন রামকৃষ্ণ, 'একদিন না একদিন পথে নিশ্চয় কেউ বলে দেবে, 'ওহে ওদিকে নয়, দক্ষিণ দিকে যাও।' আর জগন্নাথ দর্শন হবেই হবে একদিন।'

তবে একথা ঠিক যে, ওই সময়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে সাকার-নিরাকার নিয়েও বেশ মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছিলেন—'আমি বলি সকলেই তাঁকে ডাকছে, দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নেই। কেউ বলছে সাকার, কেউ বলছে নিরাকার। আমি বলি, যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই থাকুক। যারা নিরাকারে বিশ্বাস, সে নিরাকারই চিন্তা করুক। তবে এই বলা যে, মতুয়ার বুদ্ধি ভালো নয়; অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের ভুল। আমার ধর্ম ঠিক আর ওদের ধর্ম ঠিক কি ভুল, সত্য কি মিথ্যা, এ আমি বুঝতে পারছিনে—এ ভাব ভালো। কেননা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না করলে তাঁর স্বরূপ বোঝা যায় না। দেশকাল পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ। মত কিন্তু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি ভরে একটি মত আশ্রয় করলে তাঁর কাছে পৌঁছান যায়।' (কথামৃত ২/১৪/৫)

এইসব সদুপদেশ শুনলে মনে হয়, মানুষকে আর ধর্মীয় পথ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে হবে না। তবে যে কোনও পথ ধরে ঈশ্বর প্রাপ্তির ধারণাটা মনে হয় ভুল। কারণ ঠাকুর উদারধর্মীয় তত্ত্ব ঘোষণা করলেও তার ব্যতিক্রমও দেখিয়েছেন। একসময় তিনি বলছেন—'নানা পথ আছে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার। মত পথ। যেমন কালী ঘরে যেতে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়। তবে কোন পথ শুদ্ধ, কোন পথ নোংরা, শুদ্ধ পথ দিয়ে যাওয়া ভাল। ('কথামৃত') ২/২৬/৪) 'শংকরের বেদ নীতেও যেন তার আভাস ফুটে উঠেছে—'নিজেকে খোঁজ, নিজের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে যেতে পাগলের মতন পথভ্রষ্ট হয়ো না, চোখ বন্ধ করে স্মরণ কর, সহজেই বুঝতে যাঁকে তুমি খুঁজছ পাগলের মতোন, তিনি শুধু তোমার মধ্যে বিরাজ করছেন না, তিনি এবং তোমার মধ্যে কোনও দূরত্ব নেই, কারণ তুমি তো তাঁরই অংশ।'

বাস্তব জগৎ থেকে দূরে সরে এসে ঠাকুর কখনও ভাব জগতের অধিবাসী হয়ে ওঠেননি। তাই বাস্তব অভিজ্ঞতার অগোচরে ভক্তিই সার বলে মনে করেছেন। ভক্তিলাভের মধ্যে দিয়ে সর্বধর্মের সার একই বিন্দুতে সিন্ধুর মোহনায় প্রবাহিত। ঠাকুর উদার ধর্মের ঐক্য স্থাপন করে ইংরাজি শিক্ষায় মানুষের মনে আলোড়ন তুলেছিলেন। সহ সাবলীল প্রয়াসে সর্বধর্মের সমন্বয়ে ও সাম্প্রদায়িক বিভেদের মধ্যে দিব্যজীবনের আকাঙ্ক্ষিত চেতনার প্রকাশকে লক্ষ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন—'প্রত্যেক ধর্মের উৎস যেখানেই হোক না কেন, তা এক চিরসত্যের মোহনায় এসে মিলিত হয়েছে। সেই সত্যই হল মানুষকে মহৎ থেকে মহত্তম, শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম পূর্ণ থেকে পূর্ণতম, শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতম হওয়ার। প্রশ্ন হল, তা কি উপায়ে? তিনি বলেন সকলের সঙ্গে দৃঢ় আত্মিক বন্ধনের মাধ্যমে। উঁচু-নীচু, জাতপাত, ধনী-নির্ধন, সাদা-কালো ভেদাভেদের প্রাচীর ভেঙে, হৃদয়ে ব্যথিত জনের যন্ত্রণা-বেদনা অনুভব করে তা দূরীকরণের মধ্যে দিয়ে। বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে নিজে দেখতে হবে।'

স্বামী প্রেমানন্দ বলেছেন—'ঠাকুর সর্বপ্রকারের সাধন করেছিলেন। সর্বধর্মের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে কৃতার্থ হয়েছিলেন। সর্বভূতে ভগবানকে দর্শন করে তাঁর ঘৃণা, অসূয়া ছিল না। সর্বক্ষণ প্রেমে গরগর মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন। দল বাঁধাবাঁধি ভাব একেবারেই ছিল না। যিনি আত্মজ্ঞানী, যিনি প্রেমিক চূড়ামণি, যিনি সর্বধর্মপ্রাচীর ভেদ করেছেন, তাঁর আবার বেড়া প্রাচীর কি?' শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্যবাবুর কথায়—'প্রতিদিনের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে থাক একটি অবর্ণিয় পরিপূর্ণতা আসলে মন নিয়ে কথা। যে রঙে ছোপাও সেই রঙে ছুপবে। যদি উচ্চ হবার রঙটি একবার মনে লাগাও তাহলেই হল। ফুলকে যদি মন বলে সুন্দর, তা হলেও মনও সুন্দর। যদি প্রভাতের আলোকে মন বলে আনন্দময়, তা হলে সে আনন্দ মনে।'

আজকের এই চিরভাস্বর দিনটিতে মনে মনে স্মরণ করে ঠাকুরের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ

প্রণাম জানিয়ে বলি—'আমি নিজে চন্দন না হই, চন্দন যে হওয়া যায় এ আনন্দের সংবাদটিকে অন্তত বিশ্বাস করি। অসাড় হয়ে আছি বলেই এবার নিঃসাড় হয়ে রইলাম। কিন্তু তোমার স্পর্শে, কে জানে অঘটন ঘটে যেতে পারে। ঘর্ষণে যদি আগুন বেরোয়, স্পর্শনে কি সৌরভ জাগবে না? ধূলিশয্য হয়ে পড়ে আছি, কিন্তু তোমার পদধূলি যদি মাথায় নিতে পারি, যাবে না কি মালিন্য? ... আমাকে তোমার নামের মধ্যে, তোমার গানের মধ্যে নিমগ্ন করে রাখো। তোমরা মার্জনা দিয়ে ক্ষালন করে আমাকে। আমার অশ্রুকে আমি আমার মার্জনা করব। যতই বিপদে পড়ি তোমার শ্রীপদ যেন না ছাড়ি। তোমার যেমন অভিরুচি, আমাকে আঘাতে চূর্ণ করো যেন তোমার সামান্যতম ধূলিকণাটিকে মনে করতে পারি সগোত্র। আমাকে দুঃখে বিদীর্ণ করো যেন দূরতম দুঃখীজনকে স্পর্শ করতে পারি আত্মীয় বলে।

হে অনিমেষ, আমার দিনরাত্রির প্রতিটি নিমেষ যেন তোমার প্রতিঅশেষ হয়ে থাকে।'

সৌজন্যে—বর্তমান ৩১/১২/১৬

ছাদের ফুটোটা আগে সারান প্রধানমন্ত্রীজি !

বিশেষ নিবন্ধ

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

দৃশ্য এক ডাক্তার ভদ্রলোকটি আমার খুব পরিচিত। এলাকায় ভীষণ জনপ্রিয় সকাল থেকে রাত ১২টা অবধি তাঁকে চেম্বারে পাওয়া যায়, দরদ দিয়ে মানুষকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করেন। সেদিন দুপুরে এক আত্মীয়-বন্ধুদের মিলন উৎসব সোফায় আমার পাশে বসেছিলেন। হঠাৎ কী জানি কী মনে করে গলা নামিয়ে বললেন। ৮ নভেম্বর নরেন্দ্র মোদির অ্যানাউন্সমেন্টের একটু পরে বাড়িতে ফোন করেছিলাম বুঝলেন। ওয়াইফ বলল, বাড়িতে ১১ লাখ টাকা আছে। টাকা মানে, পুরানো ৫০০ আর ১০০০ টাকার নোট– কিছুক্ষণ পরেই যা তামাদি হয়ে যাবে। শুনে তো সিঁটিয়ে উঠলাম। এখনই রাত সাড়ে এগারোটা মানে বারোটার পর থেকেই নোটগুলো জঞ্জালে পরিণত হবে। কাল থেকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পুরানো নোট ফেরত নেবে বলছে বটে, কিন্তু সে মোটে আড়াই লাখ! —কেন, আপনার তো ট্যাক্স রিটার্ন দেওয়া আছে, প্রতি বছরই দেন। ভয়টা কোথায়?

—না, না, সে তো সিঙ্গি-ই, ব্যাঙ্ক থেকেই তোলা টাকা...।

—অত টাকা বাড়ি এনে রাখলেন কেন? সিকিউরিটি প্রবলেম হয়ে যাবে না? ব্যাঙ্ক থেকে তুললে সে তো হিসাবের টাকা ব্যাঙ্কেই না হয় থাকত।

—সেটা ঠিক। তবু কম রকম দরকার পড়ে, কে যাবে বারবার ব্যাঙ্কে ...।

ভদ্রলোক খানিক আমতা আমতা করে হঠাৎ সোফা থেকে উঠে গেলেন। বোঝা গেল, বেফাঁস কথা বলে ফেলে অস্বস্তি হচ্ছে।

দৃশ্য দুই একটা পুরানো মামলা ক্লোজ করতে দিন কয়েক আগে কোর্টে গিয়েছি। সেরেস্তায় বসে আছি। বেশ কিছুক্ষণ পর আমার ল'ইয়ার হন্তদন্ত হয়ে এসে একটা কাগজ বাড়িয়ে বললেন, নিন সই করুন, আজই ক্লোজ করে দেব। তারপর একটু থেমে আস্তে মি. দাশগুপ্ত, ফিজ-এর টাকাটা কি পুরানো নোটেই দেবেন? বললাম, অত নতুন নোট পাব কোথায়? লাইন মেরে মেরে কোমর ধরে গেল, লাইনে আবার ধস্তাধস্তি হচ্ছে। আমি বয়স্ক মানুষ— তার চেয়ে বরং চেকে নিন।

আঁতকে উঠলেন উকিলবাবু আরে রামোরামো ওসব কথা বলতে আছে। তার চেয়ে এক মাস পরে দিন, অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যাবে ততদিনে। আপনি তো আমার নিজের লোক।

> ভোটের প্রচারে যদি টাকা লাগে, সে টাকা জোগাবে সংশ্লিষ্ট পার্টি ফান্ড–৫ কোটি ১০ কোটি যা-ই লাগুক। অনামা 'ডোনার'দের উনিশ হাজার উনিশ হাজার করে দেওয়া কোটি কোটি টাকা দিয়ে খয়রাতি, রোড শো, ফেস্টুন ফ্লেক্স কাটআউট, মঞ্চ-মাইক, হেলিকপ্টার, মিছিলে লোক জোটানো সব কিছু মসৃণভাবে সেরে ফেলা যাবে। ভোট খরচের ক্যাপ? সে তো ভূতে জোগায়। হোক না দেশে নোট বাতিলের রাজসূয় যজ্ঞ। হোক না জনগণ নোটের আশায় তীর্থের কাক। রাজনীতিকদের কী আসে যায়। তাদের পিছনে লক্ষ লক্ষ 'উনিশ হাজার' রয়েছে না। যারা পার্টি ফান্ডে ডোনেশন ঢুকিয়ে কালা ধন কী ভাবে সাদা করতে হয়, সে বিজ্ঞানে এক একজন স্পেশালিস্ট।

টাকাটা অবশ্য নতুন নোটেই দিয়েছিলাম উকিলবাবুকে। অতগুলো কড়কড়ে নোট দেখে চারপাশ থেকে আওয়াজ আসতে লাগল—কীরে বাবু, ভাঙিয়ে দিবি নাকি? না হয় একটু উপকারেই এলি অন্য উকিলদের। মৃদু-মৃদু হাসছেন আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন আমার করুণ কাণ্ডারী উকিল মহাশয়।

হিয়ারিং শুরু হতে আরও আধঘণ্টা বাকি, সেরেস্তাতেই বসে আছি, হঠাৎ দেখলাম বড়সড় চেহারার একটি লোক নিঃশব্দে আমাদের বেঞ্চে এল। নিরাসক্ত মুখে এক উকিলবাবুর প্রশ্ন

—আপনাকে কেউ পাঠিয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার।

—কে, কর্মকারবাবু?

—হ্যাঁ স্যার।

—একটু বসুন, বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলেন ভদ্রলোক। বাইরে গিয়ে ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বললেন। তারপর ফিরে এসে এ-পকেট ও-পকেট থেকে বার করলেন দিস্তা দিস্তা পুরানো নোট। অন্য উকিলের পকেট থেকেও চলে এল নোটের মোটা মোটা পাকানো বান্ডিল।

—গুনুন, ৫০০-র চোদ্দো বান্ডিল, ১০০০-এর পাঁচ দিয়েছেন? কই দেখি। ঠিক আছে, এবার এখানে সই করুন।

অ্যাটাচি ব্যাগে সব বান্ডিল চালান করে বেঞ্চি

ছেড়ে উঠে পড়ল বড়সড় চেহারা।

—সোমবার চাই। ঠিক আছে?

—ঠিক আছে স্যার!...

বিষয়টা তাহলে কী দাঁড়াল? সেটা কি এমনই যে, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত রোগী কিংবা বিচারপ্রার্থীদের কষ্টের টাকা এমনিভাবেই হাত ফেরতা হয়ে 'কালাধন' হয়ে যাচ্ছে? ডাক্তাররা, বিশেষ করে স্পেশালিস্ট ডাক্তাররা আজকাল পাড়ায় পাড়ায় 'ফি' নেন ছ'শো, সাতশো, আটশো—রোগীপিছু কত টাকার ওপর তাঁরা ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করেন? দীর্ঘদিন আদালতে ঘুরে দেখেছি, সেটা ছিল আমার পেশাভিত্তিক এক নেশার মতো, উকিলবাবুরা ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে, এজলাসে হাজিরা দিয়ে অথবা না দিয়ে, মামলার পরের ডেট সুকৌশলে জোগাড় করে বিচারপ্রার্থীর কাছে হাত পেতে 'দক্ষিণা' নিচ্ছেন ক্যাশ টাকায়। এবং বলা বাহুল্য—সে টাকার কোনও রিসিট দিচ্ছেন না। হোক সে দক্ষিণা দু'শো, পাঁচশো অথবা দশ হাজার, বিশ হাজার। রেলের টিকিট, অফিসার অবলীলায় সার্ভিস চার্জ নিচ্ছেন, পেটি মোটা বাদে; নিজে নেওয়ার অসুবিধা থাকলে চিনিয়ে দেওয়া পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্টের হাতে টাকা গুঁজে দিতে হচ্ছে।

কর্পোরেশনের ইন্সপেক্টর, পিডব্লুডি-র সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের ডিলিং ক্লার্ক অথবা ইস্যুইং অফিসার— বলার মধ্যেই একই নাটকের অভিনয়— টাকা দাও কাজ নাও আমি কি তোমার পর? বিহার-উত্তরপ্রদেশে শুনেছি কোনও কাজ করাতে হলে সরকারি অফিসাররা চাপা স্বরে হুকুম দেন, জেব মে লেহি, কাঁহা কে নীচে রাখ দো, তুমহারা কাম হো যায়গা।...

অতএব প্রধানমন্ত্রী মোদিজি বলুন, ভারতজোড়া 'কালাধন' চক্রের এই ইস্পাত কঠিন ব্যারিকেডটি ভাঙবে কে? জনধন অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন নেই, ডাক্তারবাবুরা যদি চেম্বারে ডেকে পেয়ারের মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের রিকোয়েস্টে করেন পুরানো নোটের কালাধন নতুন নোটে পালটে দিতে— সে অনাচার রোধিবে কোন বাপের ব্যাটা?

ডিমনিটাইজেশন দিয়ে সত্যি কি দুর্নীতি ঠেকানো যায়? নোট বাতিলের প্রথম ক'দিন ব্যাঙ্কের লাইনে সে কী গুজগুজ ফুসফুস। এ বলছে ওকে, ও আবার কাকে তাকে—এ-পাড়া ও-পাড়ায় হঠাৎ বড়লোকগুলো এবার সত্যি শায়েস্তা হবে। মাছের বাজারে এসে ভুরু তুলে বলা গলদা-পাবদা যা আছে সব তুলে দে— ওসব চালবাজি আজ চলবে না। ভাঙা সাইকেল থেকে পাজেরো গাড়ি তা-ও মাত্র কয়েক বছরে—ব্যাটাদের মাজা ভেঙে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু, মাস দেড়েক গড়াতে না গড়াতেই বদলে গেল পিকচার হঠাৎ। বাবুদের পকেটফাঁকা কিনা খবর নেই, কিন্তু আমাদের পকেট যে বেবাক ফাঁকা। কাজের লোক, কাগজওয়ালা, জমাদার, মুদি, স্টেশনারি, স্কুলের মাইনে—ক্যাশ চাই ক্যাশ! কিন্তু, লাইন লাগিয়েও তা জুটছে কোথায়? এ যে দেখি '৬৩-'৬৪ সালে কাঁকরচালের খোঁজে পাড়াজোড়া সেই রেশনের লাইন। দু'ঘণ্টা পর হাতে আসছে, কুড়ি নয় চব্বিশ নয় থোক দশ বারো হাজার। ব্যাপারি দোকানদারদের মাথায় হাত, শীতের বাজারে জনমানবহীন মেলা প্রাঙ্গণ।

দুর্নীতি ঠেকাতে কী কী লাগে তার একটা নিদান দিয়েছেন অর্থনীতিবিদ অভয় ফিরার। বলছেন, যেসব দেশ দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণে এনেছে তারা কেউ নোট-বাতিলের রাস্তায় হাঁটেনি। খোলনলচে পাল্টেছে কর ব্যবস্থার, গোয়েন্দা লাগিয়েছে রিয়েল এস্টেট আর হাওয়ালার কারবারে, দামি জিনিসপত্র কেনাবেচার ওপর আয়কর দপ্তরের নজরদারি বাড়িয়েছে। আসলে এটা একটা পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া। দীর্ঘদিন ধরে ধাপে ধাপে যাকে প্রয়োগ করতে হবে। সেসব না ভেবে ধাঁ করে দেশের ৮৬ শতাংশ কারেন্সি নোট বাতিল করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের জনগণকে যেন বললেন দুর্নীতির দড়ি ধরে দিলাম টান। এইবার দেখো কাকে বলে ম্যাজিক। ম্যাজিক কি সত্যি কিছু হল? খরিফ চাষের ফসল কেনার খদ্দের নেই, রবিচাষের বীজ কেনার টাকা নেই, দেশজুড়ে ঠিকা শ্রমিকদের কাজ নেই, কারণ মজুরি দেওয়ার টাকাই নেই। অতএব, তল্পিতল্পা গুটিয়ে চল গ্রামে ফিরে যাই। কিন্তু, সেখানেই-বা টাকা কোথায়। সমবায় ব্যাঙ্কগুলোর কাউন্টারই যে বন্ধ।

হ্যাঁ, এতদিনে কিছু কিছু নতুন নোট আসছে বটে, সমবায় ব্যাঙ্কের কাউন্টারও খুলেছে। কিন্তু, প্রয়োজনের বিশাল হাঁ কতটুকু মিটছে সেই খুদকুঁড়োয়? যাঁরা গোড়াতে ব্ল্যাকমানিওয়ালাদের হেনস্থা দেখতে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তাঁরা এখন বলাবলি করছেন, নোটের রেশনিং কি ভাবে পাকাপাকি হয়ে গেল? চারপাশে, টিভিতে, কাগজে যেভাবে ডিজিটাল ট্রানজাকশনের গাজর ঝোলানো হচ্ছে, জেটলি যেভাবে দায়িত্ব নিয়ে বলছেন যত টাকা বাতিল হল তত নোট আর ফিরবে না, তাতে করে নোট রেশনিংয়ের দুঃস্বপ্ন কি অস্বাভাবিক কোনও ভাবনা?

দুর্নীতি আর ব্ল্যাক মানি আটকাতেই যদি এত বড় এক সিদ্ধান্ত, তবে রাজনৈতিক দলগুলোকে এভাবে ছেড়ে রাখা হচ্ছে কেন? সে কি এই জন্য যে, উত্তরপ্রদেশ-পাঞ্জাবে বিধানসভা ভোটের প্রচার চালাতে কষ্ট পেতে না হয়? ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্টের ১৩-র 'ক' ধারা অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোকে কখনই আয়কর দিতে হয় না। কোন দল কী কী সূত্র থেকে নিজেদের তহবিলে টাকা জোগাচ্ছে তার ওপর নজরদারির এক্তিয়ার আয়কর দপ্তরের নেই। শুধু বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি পার্টি ফান্ডে দান করে, সে দানের পরিমাণ যেন ২০ হাজার টাকা না ছাড়ায়। এই নিয়ম অনেক দিন ধরে চলছে। দেখা গিয়েছে, ২০০৫ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ছটি রাজনৈতিক দল বিজেপি, বিএসপি, এনসিপি, সিপিআই আর সিপিএম রোজগার করেছে ৫,৯৫৬ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা, যার ৭৩ শতাংশ এসেছে অজানা সূত্র থেকে। নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, অরুণ জেটলিরা যখন 'কালাধন' নিকেশ করতে' রে রে করে নেমে পড়লেন, তখন কিন্তু একবারও রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ন্ত্রণের কথা উচ্চারণ করলেন না।

এবার যখন এই নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে, তখন একটা-দুটো আশ্বাস দিয়েই তাঁরা মুখ বন্ধ করে ফেলেছেন। ভোটের প্রচারে যদি টাকা লাগে, সে টাকা জোগাবে সংশ্লিষ্ট পার্টি ফান্ড—৫ কোটি ১০ কোটি যা-ই লাগুক। অনামা 'ডোনার'দের উনিশ হাজার উনিশ হাজার করে দেওয়া কোটি কোটি টাকা দিয়ে খয়রাতি, রোড শো, ফেস্টুন ফ্লেক্স কাটআউট, মঞ্চ-মাইক, হেলিকপ্টার, মিছিলে লোক জোটানো সব কিছু মসৃণভাবে সেরে ফেলা যাবে। ভোট খরচের ক্যাপ? সে তো ভূতে জোগায়। হোক না দেশে নোটবাতিলের রাজসূয় যজ্ঞ। হোক না জনগণ নোটের আশায় তীর্থের কাক। রাজনীতিকদের কী আসে যায়। তাদের পিছনে লক্ষ লক্ষ 'উনিশ হাজার' রয়েছে না। যারা পার্টি ফান্ডে ডোনেশন ঢুকিয়ে কালা ধন কী ভাবে সাদা করতে হয়, সে বিজ্ঞানে এক একজন স্পেশালিস্ট।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু, নরেন্দ্র মোদির রাজ্য পাটের গণতন্ত্রের নয়াদিল্লির কী অবস্থা? এক সর্বভারতীয় পত্রিকার প্রতিবেদকরা জানাচ্ছেন, আজাদপুর মান্ডি, দিল্লি আর তার শহরতলি এলাকায় যে প্রতিদিন ১৫ হাজার টন ফল আর সব্জি সাপ্লাই করে, এই ভরা শীতে তারও বিক্রিবাটা কমেছে ৭০ শতাংশ। পাইকারবাদের এক ব্যাপারী আক্ষেপ করছিলেন, ওঁরা ধরেই নিয়েছেন ক্যাশ টাকা মানেই কালো টাকা কারবার। কী করে বোঝাবেন আজাদপুর মান্ডির মতো সব পাইকারি বাজারেই লেনদেন চলে ক্যাশ টাকায়। কার্ড-পেটিএম যদি চালু করতেও হয়, সেজন্য তো সময় লাগবে। তা না করে রাতারাতি নোট উধাও করলে ব্যবসা-বাণিজ্যে ধস নামতে বাধ্য। তাহলে কেন ঠুঁটো বাহুতে পা উজাড় করার বিপজ্জনক পথে হাঁটলেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী?

ফাটল ধরা ছাদ থেকে সারা বছর যদি জল পড়ে, ছাদ না সারিয়ে নীচে বালতি বসালে কোনওদিন সে জল বন্ধ করা যায়?

সৌজন্যে— বর্তমান ২৭/১২/১৬

এবার রাজ্যেও হানা দিল 'ডার্ক ওয়েব'

সাইবার-দস্যুদের খপ্পরে পড়ে চুরি গেল মালদহের সরকারি দপ্তরের তথ্য

চিরদীপ চক্রবর্তী

দিতে হবে ৩ বিট কয়েন।

মানে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় দু'লক্ষ টাকা। কিন্তু সেটা আবার নগদ বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করলে চলবে না। পেমেন্ট হবে ক্রিপ্টো কারেন্সিতে। যা কি না সাইবার স্পেসে ভেসে থাকা একটি ওয়ালেট। মালদহের ইংরেজবাজারের রাজ্য সরকারের দপ্তরে কি তা হলে হানা দিল অদৃশ্য তোলাবাজ? পুলিশকর্তারা যখন হন্যে হয়ে এর সূত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তখনই জানা যায় ওই কম্পিউটারে নীরবে ঘটে গিয়েছে 'ডার্ক ওয়েব অ্যাটাক'। আমেরিকা-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এর আগে এ ধরনের ঘটনা ঘটলেও, পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম বার হানা দিয়েছে এই অদৃশ্য নেটদস্যুরা। সাইবার ক্রাইম বিশেষজ্ঞ বিভাস চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'এই আড়ালে থাকা অপরাধীদের খুঁজে বের করা কার্যত অসম্ভব। কারণ, এই মুহূর্তে ভারতে তো দুষ্কৃতীদের আইপি অ্যাড্রেস। আর টাকার হদিস তো পাওয়াই যাবে না। এত দিন আন্ডারওয়ার্ল্ড এই প্রযুক্তি ব্যবহার করলেও, এখন মালদহের মতো শহরেও প্রয়োগ করা হচ্ছে এই প্রযুক্তি।'

কিন্তু এর নেপথ্যে আসল খেলা কার?

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই খেলার আসল খেলোয়াড় 'টর' নামে একটি ব্রাউজার। অনেক দেশ এই ব্রাউজারটিকে ইতিমধ্যেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু এ দেশে তা চলছে। এই ব্রাউজার ব্যবহার করলে সাধারণ ব্রাউজার দিয়ে তার হদিস পাওয়া যায় না। ফলে নকল আইপি অ্যাড্রেস তৈরি করে এ সব অপরাধমূলক কাজকর্ম করা হয়।

এখনকার যাবতীয় তথ্য এনক্রিপটেড করে রাখায়, তা চট করে উদ্ধার করাও যায় না। বিভাস চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে এই ধরনের ক্ষেত্রে মাত্র চার শতাংশ অ্যাকসেস পেতে পারি। বাকি ৯৬ শতাংশে ডার্ক এলাকাতেই থেকে যায়। ফলে বেশির ভাগ সময়েই নানা রকম ছদ্ম আইপি-র খোঁজ পাওয়া যায়। যা দিয়ে অপরাধীকে ধরা সম্ভব হয় না। একমাত্র হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একটি ঘটনায় অল্পের জন্যই এক ছাত্রকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছিল। কারণ সে নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটারই ব্যবহার করেছিল।'

মালদহের ঘটনাটি কী করে জানা গেল? একটি সরকারি দপ্তরে চলতি মাসের প্রথম দিকে কম্পিউটার খুলে কাজ করার সময়ে একটি পপআপ ভেসে ওঠে। সেখানে ক্লিক করার সঙ্গেসঙ্গেই অফিসের ডেটা চুরি হয়ে যায়। এর পরেই উল্লেখিত থেকে মোটা টাকা দাবি করা হয়। প্রথম দিকে পুলিশকর্তারা বিষয়টি বুঝতে না পারলেও, পরে তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেন। তাঁরাই তদন্তে নেমে জানতে পারেন, প্রায় দশ ডিজিটের একটি সংখ্যার পরে ডট ওনিয়ন নামে একটি ওয়েবসাইট থেকে ওই সরকারি তথ্যগুলি হ্যাক করে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সেই ওয়েবসাইটের আইপি নম্বরের হদিস পাওয়া যায়নি। তবে ওই সরকারি দপ্তরের সর্বোচ্চ বড়সড় বিপর্যয় এড়ানো গিয়েছে। কারণ, ওই কম্পিউটারে কুইক হিলস নামে একটি অ্যান্টি ভাইরাস লোড করা ছিল, যারা সমস্ত তথ্যের ব্যাকআপ রেখে দিয়েছিল। ফলে কয়েক দিনের মধ্যে পুরোনো যাবতীয় তথ্য ফিরে পাওয়া যায়। তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, এই হ্যাকারদের হানা এর আগে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়নি। তবে সীমান্ত ঘেঁষা মালদহ জেলায় এর থাবা যথেষ্ট চিন্তার। ভবিষ্যতে হ্যাকাররা মোটা টাকা চেয়ে নিতে পারে। আন্ডারওয়ার্ল্ডে এখনও এ ভাবেই তোলা আদায়ের কাজ করা হয়। সেই টাকা খাটানো বিভিন্ন ব্যবসায়। যার কোনও হদিস কেউ পায় না।

—সৌজন্যে এই সময় (২৮/১২/১৬)

এমপি তহবিলের টাকায় আর প্রতিষ্ঠান বা ক্লাবকে অ্যাম্বুলেন্স নয়, ফরমান দিল কেন্দ্র

সাগ্নিক ভট্টাচার্য, কলকাতা

নির্দেশ ছিল, সংসদ সদস্যের তহবিল থেকে প্রাপ্ত অ্যাম্বুলেন্সগুলি যে ক্লাব বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ব্যবহার করবে, তারা বছর শেষে অডিট রিপোর্ট জমা দেবে। এছাড়াও কেন্দ্রের নির্দেশে বলা হয়েছিল, ওই অ্যাম্বুলেন্সগুলিকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু, সেই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই ক্লাব বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া খাটিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করেছে। এতে আর্থিক অসংগতির ইঙ্গিত পেয়ে ক্ষুব্ধ কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনা রূপায়ণ মন্ত্রক। সোমবারেই চলতি বছরে এ ব্যাপারে একটি নির্দেশিকা জারি করে মন্ত্রক কড়া বার্তায় জানায়, এমপি তহবিলের টাকায় ক্লাব বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে অ্যাম্বুলেন্স কিনে দেওয়া যাবে না। শুধুমাত্র সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা সরকারি সংস্থাকেই তহবিলের টাকা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স কিনে দিতে পারবেন রাজ্যসভা বা লোকসভার সদস্যরা। এই নিয়ম লাগু হচ্ছে দেশজুড়েই।

রাজ্যে একজন বাদে (কংগ্রেস এমপি প্রদীপ ভট্টাচার্য) বাকি ১৭ জন রাজ্যসভার সদস্য এবং কলকাতার দুই সংসদ সদস্যের নোডাল সংস্থা কলকাতা পুরসভা। অর্থাৎ, এঁদের তহবিলের টাকা দিয়ে যাবতীয় উন্নয়নের কাজের তদারকি করার দায়িত্ব পুর প্রশাসনের। বছরে পাঁচ কোটি টাকা উন্নয়নের কাজে ব্যয় করতে পারেন এক-একজন এমপি।

কলকাতার ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী, রাজ্যসভার সদস্যরা বা কলকাতার দুই লোকসভার সদস্য কোনও ক্লাব বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে অ্যাম্বুলেন্স বা শববাহী গাড়ি দিতে পুরসভাকে নির্দেশ দেন। এরপর পুর প্রশাসনের এমপি ল্যাড বিভাগ অথবা অপসারণ বিভাগের মাধ্যমে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা ক্লাবকে কাগজপত্র খতিয়ে দেখে অ্যাম্বুলেন্সটিকে দেয়। তবে কলকাতা পুর এলাকা ছাড়া বাকি জেলাগুলির ক্ষেত্রে মনোনীত ক্লাব বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি কাগজ খতিয়ে দেখা বা গাড়ি কোম্পানির মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স ইস্যু করা, সব কাজই করেন সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসক।

কলকাতা পুরসভা ওই অ্যাম্বুলেন্স কেনার টাকা অনলাইনে বা চেক মারফত জেলাশাসকের অফিসে পাঠিয়ে দেয়। নয়া নির্দেশঅনুযায়ী, শহরে এই কাজ খতিয়ে দেখার জন্য কলকাতার পুর কমিশনারকে এবং জেলার ক্ষেত্রে জেলাশাসককে মাথায় রেখে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করতে হবে। সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কিংবা সরকারি কোনও সংস্থা অ্যাম্বুলেন্স হাতে পাওয়ার পর সেগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কি না, তা দেখভাল করবেন জেলাপ্রশাসন বা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক।

এক পুর আধিকারিকের কথায়, সাংসদ, সংসদ সদস্যের তহবিলের অর্থে ক্লাব বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে দেওয়া অ্যাম্বুলেন্সগুলির কোনওরকম দেখভাল হয় না। প্রায় পাঁচ থেকে দশ লক্ষ টাকা মূল্যের এই অ্যাম্বুলেন্সের অর্ধেকের বেশি কয়েক মাস চলার পরই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে।

উল্লেখ্য, এ রাজ্যে বিভিন্ন সংসদ সদস্যের তহবিলের টাকায় কেনা অ্যাম্বুলেন্স জেলামহকুমা বা গ্রামীণ এলাকায় পাঠানো হলেও, সেগুলির বেশিরভাগই অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। মেরামতের উদ্যোগ নেয়নি কেউই। অথচ, এ ধরনের একাধিক বিষয়ে যাবতীয় রিপোর্ট কলকাতা পুরসভা এবং জেলাশাসককে দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। সেখান থেকে রিপোর্ট না মেলায় তাঁরাও মন্ত্রককে অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের ব্যাপারে কোনও তথ্য জানাতে পারছেন না।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৭/১২/১৬)

দিল্লিতে মেজাজ হারালেন মমতা

প্রথম পাতার পর

দলগুলি সরে দাঁড়ানোর সাংবাদিক বৈঠক সফল করা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপরে চাপ সৃষ্টির দায় প্রাথমিক ভাবে তাঁর উপরেই বর্তেছিল। সে দিক থেকে দেখলে রাহুল ভালো নম্বরই পাবেন। তবে তাঁকে যে ভাবে এ দিন মমতা সঙ্গ দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

নোট বাতিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং তাকে কেন্দ্র করে নরেন্দ্র মোদীকে ক্ষমতাচ্যুত করার কৌশল নিয়ে দু'জনের গলায় দু'রকম সুর শোনা গিয়েছে। মানুষের দুর্দশার দায় নিয়ে অবিলম্বে মোদীর সরে যাওয়ার কথা বলেছেন মমতা। রাহুল অবশ্য প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর জবাব চেয়েছেন। তিনি চাইছেন ধাপে ধাপে মোদীকে ক্ষমতাচ্যুত করার দাবি জোরালো করতে। তবে এই পার্থক্য নেহাতই উপরে উপরে। মোদ্দা কথা, প্রধানমন্ত্রীর উপরে চাপবৃদ্ধি। সেই লক্ষ্যে দু'জনেই যে হাতে হাত রাখতে প্রস্তুত, সে বার্তা এ দিনের বৈঠক থেকে স্পষ্ট। রাহুল বিড়লা-সাহারা ডায়েরির প্রসঙ্গ তুলেছেন, মমতা তুলেছেন বিদেশ থেকে কালো টাকা উদ্ধারের প্রশ্ন। তাঁর আগমার্কা খোঁচায় মমতা জানতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যবহৃত সাবানের নাম, যা দিয়ে কালো টাকা সাদা হয়ে যায়। তাতে রাহুল তো বটেই, গুলাম নবি আজাদের মুখে পর্যন্ত হাসির ঝিলিক দেখা যায়।

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে মোদী-বিরোধী জোটের কি সলতে পাকানো শুরু করল মঙ্গলবার থেকেই? গাড়িতে ওঠার আগে রাহুলের সর্বক্ষণের সঙ্গী রাজীব শুক্লা বলে দিলেন, 'ইয়ে তো সির্ফ শুরুয়াত হ্যায়। আগে আগে দেখিয়ে হোতা হ্যায় ক্যায়া।' এ দিন মাঝেমধ্যেই মঞ্চে রাহুল-মমতাকে ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে দেখা গিয়েছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নে মমতা ছিলেন নিজের চেনা চাঁচাছোলা মেজাজে। রাহুল গান্ধী তুলনায় ধ্রুপদী ব্যাটসম্যানের মতো। তাঁর দেওয়া কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর ছিল বেশ দীর্ঘ। তবে তার ফাঁকেই রাহুল গুঁজে দিয়েছিলেন রসিকতা।

মমতা-রাহুল অবশ্য এই প্রথম একমঞ্চে এলেন না। পাটনায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নীতীশ কুমারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে তাঁদের দেখা গিয়েছিল একমঞ্চে। তখন প্রেক্ষাপটটি ছিল আলাদা। সে সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়েনি। তার আগে রাহুল-মমতার সাক্ষাৎ এবং কুশল-বিনিময় বহু জল্পনার জন্ম দিয়েছিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, মোদী-বিরোধিতায় জুড়ি নেই, তা বেশ বুঝতে পেরেছেন, ১০ জনপথের বাসিন্দারা। কিন্তু মমতার কাছে পৌঁছনোর মতো যুক্তি কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে ছিল না। নোটবন্দি সেই সুযোগ এনে দিয়েছে কংগ্রেসের সামনে। সনিয়ার প্রস্তাব পেয়ে দেরি করেননি মমতাও।

—সৌজন্যে এই সময় (২৮/১২/১৬)

Please send all articles and enquiries about Sangbad Bichitra to :
Dilip Chakrabarti,
200 Winston Drive#2920
Cliffside Park,
NJ-07010
dcha42@aol.com

Any questions for Membership or Advertisement dues, Please Contact :
Ranadeb Sarkar
346 Yale Road
Garden City, NY - 11530.
e-mail :
ranusarkar@hotmail.com

আপনার চাঁদা বাকি আছে কিনা জানতে চাইছেন? আপনার নাম ঠিকানা লেখা লেবেলে (প্রথম পাতায়) একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

The Sangbad Bichitra, Periodical (USPS#020-877) is published semi-monthly by Cultural Association of Bengal from 200 Winston Drive#2920, Cliffside Park, NJ-07010
and
additional mailing offices.
POSTMASTER :
Send address changes to Sangbad Bichitra,
4 Entrance Way, Purdys NY 10578

তিন তালাক ধর্ম বনাম রাজনীতি

জিনাত রেহেনা ইসলাম

বিশ্ব জুড়ে, নারী অবমাননা ও নিগ্রহের পরিধি ক্রমশ বাড়ছে। সভ্যতার ক্রমাগত উত্কর্ষ আর শুভবুদ্ধির বিস্তারের পাশাপাশি যে সব বিষয়গুলিকে নিয়ে আওয়ার কথা — এরকম অনেকগুলিই অশুভ প্রথা ও প্রবৃত্তি সমাজের স্তরে স্তরে আজও স্বমহিমায় সুসজ্জিত। অথচ এ সব কদর্যীয় আবরণকে সরাতে চাইছে বিজ্ঞান চেতনায় প্রাণিত আধুনিক মনন। কিন্তু অচলায়তনের অবগুণ্ঠনকে গায়ের জোরে বহাল রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কিছু কিছু সংগঠন ও আপ্তেমি প্রতিষ্ঠান। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড ও অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠন নিশ্চিতভাবে এদের বাইরে নয়। মুসলিম ল বোর্ড সম্প্রতি তাত্ক্ষণিক তিন তালাকের বৈধ্যতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে এফিডেবিট দাখিল করে বলেছে, 'তুলনামূলকভাবে পুরুষ নারীর তুলনায় বেশি শক্তিশালী। তাঁরা মহিলাদের ওপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু এদের নিরাপত্তার জন্য পুরুষের প্রয়োজন।' — বিশ্বে অন্য কোথাও সর্বোচ্চ আদালতে কখনও এ রকম কোনও আবেদন পেশ করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এই জ্ঞানের পশ্চাৎপদতা, চিন্তার স্থবিরতা সামাজিক অগ্রগতির পথকে নিশ্চিতভাবে পিছিয়ে করে রেখেছে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, ৩০ বছর আগে রাজনীতির আবর্তে পড়ে শাহ বানু মামলার রায় যেভাবে দিশা হারিয়েছিল, একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সায়রা বানুর হাত ধরেও কি ইতিহাসের একই পুনরাবৃত্তি ঘটবে? ৮ডিসেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্ট ভিন্ন একটি মামলায় তিন তালাক প্রথাকে অমানবিক বলে ঘোষণা করেছে। এ রায় নিয়েও ভোটমুখী রাজনীতি আর ধর্মীয় আইন রক্ষকদের মধ্যে জোর তরজা শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি বড় ঘোলাটে। শিকারিরা মাছ ধরতে ব্যস্ত।

ব্যক্তিগত আইন নিয়ে সমকাল বা অদূর অতীতে বিশ্ব কী ভেবেছে, ভাবছে, প্রসঙ্গত একটু খতিয়ে দেখা দরকার। ১৯৫৭ সালে, তিউনিসিয়া 'কোড অফ পার্সোনাল স্ট্যাটাস'-এ দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে, বহুবিবাহ বেআইনি ও দণ্ডনীয় অপরাধ। এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, তাহলে তাকে জরিমানা দিতে হবে, তার হাজতবাসও অপরিহার্য। ৫৮ সালে মরক্কোও তার ব্যক্তিগত আইনকে আরও সংহত করে জানিয়ে দেয় যে, পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহ অপরিহার্য হয়ে উঠলে, তাকে আদালতের অনুমতি নিতে হবে। আদালত সন্তুষ্ট না হলে দ্বিতীয়বার বিয়ে করা চলবে না। ১৯৬৯ সালে, ডক্টর মুসাদ্দেক শাসিত ইরানও ব্যক্তিগত আইন তৈরি করে। ইরানি বিধিতেও বলা হয়। প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিবাহের জন্য আদালতের অনুমতিগ্রহণ অত্যাবশ্যক। প্রায় একই সময়ে, ইন্দোনেশিয়া ব্যক্তিগত আইন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশটি কেবল পুরুষশাসিত দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ বিবাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি, আদালতের বাইরে তালাক দেওয়াকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে দেয়। ষাটের দশকের গোড়ায়, বিচারপতি মুনিরের নেতৃত্বে জনৈক কমিশন বসায় পাকিস্তান। মুনির কমিটি সুপারিশ করে, গার্হস্থ্য অপরাধ ও নারী অবমাননা রুখতে ব্যক্তিগত আইনের সংস্কার প্রয়োজন। আয়ুব খান তখন সামরিক শাসক। তিনি কালবিলম্ব না করে আইন অনুযায়ী বহুবিবাহ ও তাৎক্ষণিক তালাক নিষিদ্ধ করে দেন। পরে জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নারী নিগ্রহ রুখতে আরও কঠোর হয়ে ওঠে। বহুবিবাহ, তাৎক্ষণিক তালাকে নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

ইসলামের ব্যবহারবিধিতে ব্যক্তিগত আইনের কোনও পরিসর ছিল না। মুসলিম উলামারাও বিষয়টি নিয়ে কখনও ভাবেননি। প্রাসঙ্গিক যে কোনও বিষয় আশয় নিয়ে শরিয়তের নির্দেশকে চূড়ান্ত বলে মনে করতেন। ব্রিটিশ আমলের তৃতীয় দশকের প্রায় শেষ পর্বে ভারতে প্রথম মুসলিম ব্যক্তিগত আইন চিহ্নিত হয়। ১৯৩৯ সালেই প্রথম বলা হল, চারটি উপায়ে তালাক সম্পন্ন হতে পারে। এক, আদালতের দ্বারস্থ হয়ে। দুই, নিরাপত্তামূলক বিবাহ বিচ্ছেদের আশ্রয় নিয়ে। তিন, খুলার মাধ্যমে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী তাঁর সম্পর্ক ছেদ করতে পারেন। চার, মুবারাত অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে বিবাহিত সম্পর্কের অবসান হতে পারে।

এবার প্রশ্ন উঠবে, ৩৯ সালের বিবাহ বিচ্ছেদ আইন স্বামী-স্ত্রী, বিশেষ করে মহিলাদের যে অধিকার দিয়েছে, তার সঙ্গে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন পর্ষদের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য কোথায়? ২০১৫-এর ৩ সেপ্টেম্বর জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে মুসলিম ল বোর্ড সিদ্ধান্ত নেয়, এক সঙ্গে তিনবার তালাক উচ্চারণ করা মানেই বিবাহ বিচ্ছেদ। তাঁদের এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে কোরান ও হদিসের (যা শরিয়তের প্রাথমিক ও একমাত্র উৎস) মিল আছে কি না — খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত আইনের সার্বিক ব্যাখ্যা কতটা সময়োপযোগী — তা কি আমরা ভেবে দেখব না? বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার বলেছিলেন, সময়ের নিরিখে ব্যক্তিগত আইনের 'কোডিফিকেশন' প্রয়োজন। এই অভিমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অনেকের অজ্ঞানতা প্রসূত সাধারণ ধারণা হচ্ছে এই যে ব্যক্তিগত আইন নিয়ে সংহত গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু আদপে এ রকম কোনও সঙ্কলন নেই। কোরান-হদিসের বিভিন্ন নির্দেশ ও বার্তাই ব্যক্তিক অথবা পারিবারিক আইনের এক এবং অদ্বিতীয় ভিত্তি। ইহজীবনের নানা সমস্যা নিয়ে ইসলামি ব্যবহার-বিধি (ফেকাহ, জুরিসপ্রুডেন্স) তৈরি হয়েছে। এবং তা হজরত মহম্মদের মৃত্যুর অনেক পরে। ধর্মীয় আইন বিশেষজ্ঞরা যাবতীয় সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন প্রথমত কোরানে, দ্বিতীয় হজরত মহম্মদের বাণীর (হদিস), তৃতীয়ত তাঁর জীবনাদর্শে। এই তিন উৎসই ফেকাহ বা ব্যবহারবিধির প্রধান অবলম্বন। বিবাহ-বিচ্ছেদ অথবা পারিবারিক আইনকেও অনুশাসিত বিধির দ্বারস্থ হতে হয়। মনে রাখা দরকার, গ্রন্থবদ্ধ আইন না থাকার জন্য তালাক বা সম্পত্তির অধিকার নিয়ে মতানৈক্যের দুরাচার অব্যাহত। রাষ্ট্র কিংবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সবাই যুক্তিসম্মত সমাধান খাড়া করতে ব্যর্থ। বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের নির্দেশিত পথে সমস্যার উত্তর খুঁজতে হবে। না হলে নৈরাজ্য ও অনাচার বাড়বে। বাড়তে থাকবে গার্হস্থ্য অপরাধ।

এবার দেখা যাক, কোরান ও ইসলামি ব্যবহার-বিধি তালাক সম্পর্কে কী ভেবেছে, গুরুতর সমস্যার রেহাই খুঁজেছে কোন পথে? বিবাহ-বিচ্ছেদ নিয়ে কোরানে 'তালাক' শিরোনামে পরিপূর্ণ একটি সূরা (অধ্যায়) আছে। তার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে (আয়াত) বলা হয়েছে — ১। তালাক ঘোষণা করলে স্ত্রীর ইদ্দত লক্ষ করতে হবে। ২। ইদ্দতের দিন গুনতে হবে (ইদ্দত মানে মহিলাদের রজঃস্রাবের মাসিক চক্র)। ৩। নির্লজ্জ কাজ (বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচার/ব্যভিচার ইত্যাদি) প্রমাণিত না হলে স্ত্রীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করো না — অর্থাৎ তালাক দেওয়া চলবে না। এই তিন বিষয়ই ঈশ্বর নির্দেশিত তালাকের নির্ধারিত সীমা — একে যে লঙ্ঘন করবে, তার সর্বনাশ অনিবার্য।

একই সূরার দ্বিতীয় স্তবকের নির্দেশ — ইদ্দতকালে পৌঁছলে স্ত্রীকে আবার গ্রহণ করা সম্ভব। এ ব্যাপারে দুজনের সহমত জরুরি অর্থাৎ মিল হলে দাম্পত্য টিকবে, না হলে ঘোষিত বিচ্ছেদ অপরিহার্য।

সূরা বকারাও (গো শাবক) বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ জারি করেছে। ২২৮ নম্বর পঙ্‌ক্তিতে বলা হয়েছে, — ১। তালাকপ্রাপ্ত মহিলা তিন মাস অপেক্ষা করে — মানে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের পর অন্য কারও সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন। ২। তাৎক্ষণিক তালাক ও তাৎক্ষণিক বিবাহ নিষিদ্ধ (কেন না তিন মাসের আগে জন্মাবধুর অন্তর্বীজের সাকার চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না)। ৩। তিন মাসের মধ্যে যদি স্বামী স্ত্রী সম্ভাব বজায় রাখতে সম্মত হন, তাহলে পুনরায় তাঁরা দাম্পত্যে ফিরে আসতে পারেন। ৪। যেমন পুরুষের, তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে মহিলারাও তালাক দেওয়ার অধিকার রয়েছে।

একই সূরা-র (কোরান) ২২৯ পঙ্‌ক্তিতেও বলা হয়েছে — ১। নিয়ম মেনে তালাক সম্পূর্ণ করতে হবে। অর্থাৎ তিন ঋতুচক্র শেষ হওয়ার পর। ২। ইদ্দত (রজঃস্রাব) খতিয়ে দেখে দ্বিতীয়বার তালাক ঘোষণার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে হবে। ৩। বিয়ের সময় স্ত্রীকে প্রদত্ত সম্পদ (দেন মোহর) ফিরিয়ে নেওয়া চলবে না। ৪। ধনসম্পদের বিনিময়ে স্ত্রী যদি তালাক গ্রহণ করতে সম্মত হন, তা অবৈধ নয়। সম্পত্তির বিনিময়ে দিয়ে স্ত্রী তাঁর স্বামীর কাছে খুলা (রেহাই, মুক্তি, বিচ্ছেদ) চাইতে পারেন।

২৩১ নম্বর আয়াতে আবার বলা হয়েছে, যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দাও, যখন তারা নির্ধারিত 'ইদ্দত' সম্পূর্ণ করে নেয়, তখন নিয়ম মেনে তাদের আবার গ্রহণ করবে, অথবা সহানুভূতির সঙ্গে মুক্ত করে দেবে। কিন্তু জ্বালাতন বা বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে পরিত্যক্ত স্ত্রীকে আটকে রাখবে না। যারা এ রকম ঘৃণ্য কাজ করে, তারা নিজেদেরই ক্ষতি করে।

বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে, নারীর অধিকার নিয়ে হদিস-এর নির্দেশ আরও স্পষ্ট, অধিকতর দৃঢ়।

১। রাগের মাথায় তালাক দিলে তা কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না। ২। নিদ্রিত ও উন্মাদ অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা অবৈধ। ৩। একসঙ্গে তিন তালাক বেআইনি। ৪। কেউ যদি তার স্ত্রীকে হারাম (অপবিত্র) বলে ঘোষণা করে, তাহলে তা তালাক নয়। ৫। তালাক-এর সঙ্গে মহিলাদের ঋতুচক্র জড়িত। রজঃস্রাবের মুহূর্তে কেউ যদি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে, তাহলে তাকে দ্বিতীয়, তৃতীয় রজঃস্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং ঋতুচক্র সম্পূর্ণ হওয়ার পরই চূড়ান্ত বিচ্ছেদের ঘোষণা বাঞ্ছনীয়।

আইনের পথে বিবাহ বিচ্ছেদ

তালাকের ধর্মশাসিত নির্দেশ আর রাষ্ট্রীয় আইনের পথে বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যে বিশেষ কোনও ফারাক আছে বলে মনে হয় না। শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য অথবা সমঝোতাভিত্তিক বিচ্ছেদ উভয়েরই কাম্য। ভারতীয় আইনে বলা হয়েছে। ১। চার বছর জুড়ে স্বামীর অনুপস্থিতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ গ্রহণযোগ্য। ২। টানা দু বছর স্বামী যদি ভরণপোষণ দিতে অস্বীকার করেন, তাহলে স্ত্রী বিচ্ছেদ চাইতে পারবেন। ৩। বহুবিবাহ করে স্বামী যদি চুক্তি ভঙ্গ করেন, তাহলে স্ত্রী দাম্পত্যের অবসান দাবি করতে পারবেন। ৪। স্বামীর যৌন অক্ষমতা প্রমাণিত হলে, স্ত্রীর বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। ৫। স্বামী টানা ৭ বছর জেলে থাকলে স্ত্রীর দিক থেকে বিচ্ছেদ-প্রস্তাব আইনসম্মত। ৬। মানসিক নিগ্রহ বা শারীরিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ যে কোনও বিবাহিত মহিলার বিচ্ছেদের অধিকার রয়েছে। তাহলে আইন ও ধর্মীয় অনুশাসনের আক্ষরিক সমাধান সূত্রকে মেনে চলতে ভারতের মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের পর্ষদের বাধা কোথায়? ইসলামের ব্যবহার বিধির অপব্যাখ্যাই কি তাঁদের সার্বিক চিন্তার, পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতাতন্ত্রের ভিত্তি হয়ে থাকবে? বিবেক, যুক্তি ও ইতিহাসের প্রবাহ থেকে তাঁরা কি দূরে সরতে সরতে ক্রমাগত হাস্যকর হতে থাকবেন? তাঁরা বলছেন, তিন তালাক-প্রথা না থাকলে পরিত্রাণ পেতে পুরুষ স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারবে, খুন করবে। তাঁদের এ বক্তব্যের ভিত্তি কী? পরিসংখ্যান কোথায়? যে সমাজে তালাকের রেওয়াজ নেই, সেখানে নারীনিগ্রহ কি নিত্যকার ঘটনা? নাকি মুসলিম সমাজে গার্হস্থ্য অপরাধ সীমিত? বিবেক এই ধরনের প্রশ্ন তুলছে। তুলতে থাকবে। আরও কয়েকটি কথা, অধিকারের অর্জন মানুষকে শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেয়। ধর্ম দেয় নিজেকে ধারণের বিশ্বাস। প্রতিষ্ঠান আর প্রচলিত ব্যবস্থা যখন অপব্যবহারের অস্ত্র হয়ে ওঠে, তখন শুভবুদ্ধি ঐক্যের দাবি তুলে গণজাগরণ ঘটিয়ে দেয়। আর এ রকম মুহূর্তে চতুর রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের কলাকৌশল পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ কোলাহল তৈরি করে। তালাকের বৈধতা নিয়ে অকারণ অস্থির আর এ প্রথা বাতিলের সমর্থনে ইদানীং যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চোখে ভাসছে, তা আমাদের শানিতটি শঙ্কিত করে তুলছে। নেপথ্য কাহিনী অবশ্য অপরিচিত নয়। সূর্যালোক ভেতরে ঢুকছে, খুলে দিচ্ছে রহস্যজাল আর অতিবিজ্ঞাপিত মুখের মুখোশ। ভবিষ্যৎ কখনও অনিশ্চিত, অসীমায়িত থাকে না। তার চিরন্তন প্রবাহ (জিজ্ঞাসা) নারীকে স্পর্শ করছে, মুক্ত করছে তাঁদের আত্মবিশ্বাসের দরজা। বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দূরত্ব আর কতটুকু! রাত পোহালেই ভোর, দুপুর আর অপরাহ্নের চাঞ্চল্য। তুমি কি এই যাপনের সঙ্গী হবে না বন্ধু, হে প্রিয়?

—সৌজন্যে আজকাল (১৬/১২/১৬)

গ্রেপ্তার আইনজীবী রোহিত ট্যান্ডন

দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার হলেন বিতর্কিত আইনজীবী রোহিত ট্যান্ডন অর্থ তছরুপের একটি মামলায় যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। নোট বাতিল পরবর্তী সময়ে কালো টাকা বিরোধী অভিযানে একটি ল ফার্মে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ ১৩.৬ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছিল। ওই ল ফার্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ট্যান্ডন।

বিগত কয়েকদিন ধরেই ট্যান্ডনকে জেরা করছিল ইডি। সরকারি সূত্রের খবর অনুযায়ী, রাতে এই আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করা হয় অর্থ তছরুপ প্রতিরোধ আইনে (পিএমএলএ)। তদন্তকারী সংস্থাটির সন্দেহ, বেআইনিভাবে ৬০ কোটি টাকার বাতিল নোট বদলের ঘটনায় সাহায্য করেছিলেন ট্যান্ডন। এই ঘটনায় কলকাতার ব্যবসায়ী পরশমল লোধা ও দিল্লিতে কোটাক ব্যাঙ্কের ধৃত ম্যানেজার আশিস কুমারের সঙ্গে যোগসাজশ ছিল এই আইনজীবীর।

নোট বাতিল পরবর্তী সময়ে দুটি হাই-প্রোফাইল কালো টাকা চক্র ইতিমধ্যেই তদন্তকারীদের জালে এসেছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে বেশ কয়েকজন রাঘববোয়ালকে। সেই তালিকায় এবার নাম উঠল ট্যান্ডনেরও। এর আগে চেন্নাই থেকে সিবিআই গ্রেপ্তার করেছে রেড্ডিকে। লোধা ও কুমারকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে ইডি। পাশাপাশি চেন্নাই থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরও দুই রাঘববোয়ালকে। দিল্লিতে লোধা ও ট্যান্ডনকে জেরা করছে ইডি। এমনকী তাঁদের মুখোমুখি বসিয়েও জেরা করা হয়েছে। সূত্রের দাবি, জেরায় প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করার চেষ্টা করছিলেন এই আইনজীবী। সেজন্যও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল।

এদিকে, কটকে জনধন অ্যাকাউন্টে সন্দেহজনক লেনদেন নিয়ে তদন্ত শুরু করল পুলিশ। নোট বাতিলের পর একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ১০ জন সদস্যের অ্যাকাউন্টে দফায় দফায় জমা পড়েছে বিশাল পরিমাণ টাকা। দফায় দফায় সেই টাকা প্রত্যাহারের ঘটনাও ঘটেছে। গত বছর একটি ব্যাঙ্কের গোপীনাথ শাখায় ওই জনধন অ্যাকাউন্টগুলি খোলা হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে একবারের জন্যও ওই অ্যাকাউন্টগুলির ব্যবহার করা হয়নি। যদিও নোটবাতিলের পর সেখানে লেনদেন হতে শুরু করে বিশাল করে বিশাল পরিমাণ টাকা। কটকের ডিএসপি সঞ্জীব আরোরা বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা তদন্ত করছি। অপরাধের ঘটনা ঘটে থাকলে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ করা হবে। ঘটনাচক্রে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ওই সদস্যদের বক্তব্য, তাঁদের অ্যাকাউন্টে এই বিশাল পরিমাণে টাকা জমা হওয়ার কথা তাঁদের জানাই নেই। বিষয়টি শুনে তাঁরা অবাক হচ্ছেন। ভবিষ্যতে ঋণ পাওয়ার আশায় তাঁরা ওই জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। তাঁদের অজান্তেই টাকা জমা পড়ার বিষয়টি জানালেও বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চাননি ব্যাঙ্কের কর্তারা।

তবে ব্যাঙ্কের কর্তাদের প্রতিক্রিয়া জানা সম্ভব হয়নি।

সৌজন্যে : বর্তমান ৩০/১২/১৬

হ্যান্ডলুম লিনেনের হাত ধরে তন্তুজও ডিজাইনার

ফ্যাশন সচেতন ক্রেতাদের বাজার ধরতে নয়া উদ্যোগ তন্তুজের। ডিজাইনারদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এবার লিনেনের ডিজাইনার রেঞ্জ তাঁদের বাজারে আনল তন্তুজ। মঙ্গলবার সল্টলেকের এক হোটেলে জাঁকজমক সহকারে ডিজাইনার অভিষেক দত্তর ডিজাইন করা পোশাকের উদ্বোধন করেন ক্ষুদ্র-কুটির ও মাঝারি শিল্পমন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

হ্যান্ডলুম। ফ্যাশন দুনিয়ায় এখন হটকেকের মতো বিকোচ্ছে এই নামটাই। তা সে সিল্কই হোক বা কটন। শাড়িই হোক বা ড্রেস মেটেরিয়াল — এটিই থেকে মধ্যবিত্ত। মধ্যবয়স্ক থেকে ইয়ংস্টার সবার পছন্দের তালিকায় এখন উপরের সারিতে

খুশি ফ্যাশন দুনিয়া

রয়েছে হ্যান্ডলুমে তৈরি পোশাকই। কলকাতার মতো আবহাওয়ায়, যদি লিনেনের মতো আরামদায়ক ফেব্রিকের সঙ্গে হ্যান্ডলুমের যুগলবন্দি হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা! 'ক্লাস অ্যান্ড কমফোর্ট'-এর এমন জুটির দিকে বেশ কিছুদিন ধরেই ঝুঁকতে শুরু করেছেন ফ্যাশনদুরস্ত কলকাতাবাসী। নামজাদা দেশি, বিদেশি ব্র্যান্ডের লিনেনের পোশাক বাজারেও হাজির। কিন্তু সমস্যা একটাই। হয় সব পোশাক ১০০ শতাংশ হ্যান্ডলুমে তৈরি নয়। আর হলে, তার দাম বেশ চড়া। যদি সেটা ডিজাইনার প্রোডাক্ট হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। সটান মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যায়।

লিনেনপ্রিয়দের এই দশাকেই টার্গেট করে প্রথমবার লিনেনের পোশাক বাজারে আনার উদ্যোগ তন্তুজের। দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, 'মানুষের পোশাকের পছন্দ বদলাচ্ছে। বাংলার তাঁত শিল্পীদের নতুন দিশা দেখিয়ে আমাদের গ্রাম বাংলার শিল্পকে মানুষের আরও কাছে পৌঁছে দেওয়া আর তাঁত শিল্পীদের কাজের নিশ্চিত সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

বস্ত্র দপ্তরের তরফে পাওয়া ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ নিয়ে এই প্রকল্প শুরু করেছে তন্তুজ। তাঁদের অধীনস্থ সোসাইটিদের মধ্যে ফুলিয়ার তিনটি সোসাইটির মোট ১৮০ জন তাঁতশিল্পীদের দিয়ে প্রথম ধাপের লিনেনের ফ্যাব্রিক তৈরি করিয়েছেন তন্তুজ কর্তারা। লিনেনের মতো মজবুত ফাইবারকে নরম করে ডিজাইনার পোশাক তৈরির উপযোগী করে তুলতে সুতাে থেকে বানানো হয়েছে বিশেষ যন্ত্রও। তারপর সেই ফ্যাব্রিক তুলে দেওয়া হয়েছে বাঙালি ডিজাইনার অভিষেক দত্তর হাতে।

তাঁদের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত তন্তুজে কী ধরনের লিনেনের পোশাক মিলবে? ডিজাইনার অভিষেক দত্ত বলেন, 'তন্তুজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মিথটাই ভাঙতে চেয়েছিলাম আমি। এমন পোশাক তৈরি করতে চেয়েছিলাম, যেটা দেখে মধ্যবয়স্কদের সঙ্গে সঙ্গেই তরুণ-তরুণীরাও আগ্রহী হন তন্তুজের পোশাক কিনতে।' আর তাই পোশাকের তালিকাটি বেশ দীর্ঘ। পুরুষদের ফর্মাল জ্যাকেট থেকে মহিলাদের ড্রেস। রেগুলার ওয়্যারের কুর্তি থেকে শার্ট, পাঞ্জাবি থেকে শাড়ি, এমনকি লিনেন-লেদারের জুতো। লিনেন-ডেনিমের প্যান্ট-এর মতো নজরকাড়া পোশাকও জুড়েছে তন্তুজের এই নয়া কালেকশনে। তন্তুজ কর্তৃপক্ষের দাবি, দাম রাখা হয়েছে মধ্যবিত্তের দামের নাগালে।

আপাতত, সল্টলেকে তন্তুজের মূল বিপণি এবং গিরিশ স্ট্রিটের শো-রুমেই মিলবে লিনেনের নয়া কালেকশন। দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর অসীম মাইতি বলেন, 'ধীরে ধীরে কলকাতায় আমাদের যে ১০টি শো রুম আছে, তার প্রত্যেকটিতেই আমাদের নতুন এই লিনেনের কালেকশন রাখা হবে।' কর্তৃপক্ষের আশা, সব ঠিকঠাক গেলে আগামী দু'বছরের মধ্যে এক হাজারের কাছাকাছি তাঁতশিল্পীকে আনা হবে এই লিনেন প্রকল্পের আওতায়।

মঙ্গলবার অনুষ্ঠানে সেলিব্রেটিদের পাশেই উপস্থিত ছিলেন লিনেন প্রস্তুতকারক তন্তুবায় সমবায়ের সদস্যরাও। নতুন ফুলিয়া তন্তুবায় সমবায়ের সদস্য দেবাশিস বসাক বলেন, 'আজকাল লিনেনের চাহিদা প্রচুর। বিশেষত, হ্যান্ডলুম লিনেনের। আর আমাদের তৈরি করা লিনেন দিয়ে যা সব সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় তৈরি হয়েছে, তা ভাবতেই পারছি না। খুব ভালো লাগছে।' সরকারি সংস্থার নতুন লিনেন রেঞ্জ দেখে খুশি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তও। তিনি বলেন, 'দারুন স্টাইল হতে পারে তন্তুজের পোশাকগুলো। আমি চাইব এই প্রকল্প অনেক দূর এগোক। তাঁতশিল্পীরা তাঁদের যোগ্য সম্মান পাক।'

—সৌজন্যে এই সময়
(২৮/১২/১৬)

অনুদানে কোপ পড়ায় মাথায় হাত ক্লাবগুলির

কৌশিক চৌধুরী, শিলিগুড়ি

গত কয়েক বছর ধরে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। সেই অভ্যাস মতো কেউ ক্লাবের ব্যাডমিন্টন ক্যাম্পে কোনও ভাল প্রশিক্ষক আনবেন বলে ভাবছিলেন। কোনও ক্লাব আবার ফুটবল ক্যাম্প নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিল। কিন্তু সোমবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের এক ঘোষণায় অন্তত এ বছরের জন্য অভ্যাসের ইতি। মন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, এ বছর উৎসব মঞ্চ থেকে কোনও ক্লাবকে অনুদান দেওয়া হচ্ছে না। কারণ, নোট বাতিলের জেরে উৎসবের বাজেটই কমে গিয়েছে।

মন্ত্রীর এই ঘোষণায় ক্লাবকর্তারা অধিকাংশই এখন হতাশ। সোমবার রাত থেকে তাঁরা স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগও শুরু করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, "২০১৬-তে বিধানসভা ভোট হয়েছে। সরকারের আর্থিক অবস্থা যেমনই থাকুক না কেন, ভোটের আগে উৎসবে জেলার ক্লাবগুলিকে টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন তো আর ভোট নেই। তাই সরকারের ক্লাবকে নিয়ে চিন্তাও নেই।"

উৎসব ও ক্লাবের পিছনে খরচাপাতির জন্য বিরোধীরা গত পাঁচ বছর ধরে বারবার কাঠগড়ায় তোলার চেষ্টা করেছেন সরকারকে। এমনকী এই অভিযোগও করা হয়েছে যে, মহার্ঘভাতা বাকি রেখে ক্লাব আর উৎসবে মেতে আছে সরকার। তা সত্ত্বেও অনুদান বন্ধ করা হয়নি। উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের অনেক নেতাই ঘরোয়া আলোচনায় মানছেন, ক্লাবগুলিকে অনুদান দেওয়ার ফলে পাড়ায় পাড়ায় শাসকদলের সংগঠন বেড়েছে, মজবুতও হয়েছে। কোচবিহার, রায়গঞ্জের কয়েক জন ক্লাবকর্তাও সে কথা বলেছেন। তৃণমূল নেতারা জানিয়েছেন, বহু ক্লাবের সদস্যরা ভোটে দলের হয়ে কাজকর্মও করেছেন। তাঁদের এখন প্রশ্ন, অনুদান বন্ধ হয়ে গেলে তৃণমূলের প্রভাব প্রতিপত্তি কমে যাবে না তো? ক্লাবগুলি যে সমস্যায় পড়বে সে কথা রবীন্দ্রনাথবাবুও মেনে নিয়েছেন। তবে উত্তরবঙ্গের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতাই মনে করছেন, এত দিন ধরে যে ভিত তৈরি হয়েছে, তাতে ফাটল ধরার সম্ভাবনা আপাতত নেই।

ক্লাবগুলির বক্তব্য, যে অনুদানের কথা মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছিলেন, তা এক কথায় বন্ধ হয়ে যায় কী করে! শিলিগুড়ির অন্যতম যুবক সঙ্ঘের গুরু দে বা ইউনাইটেড ক্লাবের সম্পাদক কার্তিক মজুমদার বলছেন, এই টাকার উপরে ভিত্তি করে আমরা ক্লাবের পরিকল্পনা করে থাকি। সারা বছর ধরে আমরা কোচিং, ক্যাম্প, নানান প্রতিযোগিতা করি। সেগুলো সব থেমে থাকবে।

অরুণোদয় সঙ্ঘের সম্পাদক দেবজ্যোতি বিশ্বাস জানালেন, এ বার ব্যাডমিন্টন ক্যাম্প করার কথা ছিল তাঁদের। বললেন, "দেখি, কী ভাবে টাকা জোগাড় করা যায়!"

গত বছর উত্তরবঙ্গ উৎসবে ১২০টি ক্লাবকে ৫০ হাজার এবং ১০০টি ক্লাবকে ২৫ হাজার করে দেওয়া হয়েছে। এ বারে মন্ত্রীর ঘোষণা সত্ত্বেও তৃণমূল ছোট-বড় নেতারা এখনই হাল ছাড়তে নারাজ। তাঁদের কয়েক জন জানান, এবার জেলাভিত্তিক ১০টি করে ক্লাবকে টাকা দেওয়া হবে বলে মোটামুটি ঠিক হয়েছিল। নোট বাতিলের জেরে পরিস্থিতি পাল্টাচ্ছে। তা-ও কলকাতায় বিভিন্ন স্তরে যোগাযোগ করা হচ্ছিল। তাঁদের আশা, মুখ্যমন্ত্রী চাইলে, শেষ অবধি পরিকল্পনা বদলাতেও পারে।

প্রশ্ন হল, অনুদান বন্ধের কথা কলকাতায় কতটা পৌঁছেছে?

ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বললেন, "এই নিয়ে আমার কোনও ধারণাই নেই। তাই কিছুই বলতে পারব না।"

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা
(২৮/১২/১৬)

নোট বাতিলের জেরে রাজ্যের আয় কমেছে ৬ হাজার কোটি

সঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা

নোট বাতিলের ধাক্কায় রাজ্য সরকারের রাজস্ব আয়ে বেশ প্রভাব পড়েছে। তৃতীয় ত্রৈমাসিক রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা কম আয় হয়েছে। বিশেষ করে বিক্রয় কর, বাণিজ্য কর, আবগারি শুল্ক, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি প্রভৃতি থেকে রাজ্য সরকারের রাজস্ব আদায় বেশি হয়। এই সব ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক কম আয় হয়েছে। তাই চিন্তায় পড়েছেন নবান্নের শীর্ষকর্তারা। পরিস্থিতি এমনই যে বেশ কিছু দপ্তরের বরাদ্দ কাটছাঁট করতে চলেছে নবান্ন। এভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনগুলিতে আরও সমস্যায় পড়তে হবে রাজ্য সরকারকে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের বছরে খরচ হয় দেড় লক্ষ কোটি টাকা। তার মধ্যে সরকারি কর্মচারীদের বেতন দিতে বছরে খরচ হয় ৩০ হাজার

হিমশিম নবান্ন ● বরাদ্দ কাটছাঁটের ভাবনা

কোটি টাকা। পেনশনের জন্য খরচ হয় ১৫ হাজার কোটি টাকা। বাম আমলে নেওয়া ঋণের উপর সুদের জন্য দিতে হয় ৩০ হাজার কোটি টাকা। কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, সবুজসাথি, বিভিন্ন ক্লাবকে অনুদান দিতে খরচ হয় ১০ হাজার কোটি টাকা। খাদ্যসাথি প্রকল্পে খরচ হয় ৪ হাজার কোটি টাকা। পরিকাঠামো খাতে খরচ হয় ১ হাজার কোটি টাকা। রাস্তা, উড়ালপুল, স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা খাতে খরচ ধরা হয়েছিল ৫৩ হাজার কোটি টাকা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজ্যে কর বাবদ রাজস্ব অনেক বাড়িয়েছে।

২০১০-১১ সালে যা ছিল ২১ হাজার ১২৮ কোটি টাকা, ২০১৫-১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪২ হাজার ৯১৬ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। ২০১৬-১৭ সালের বাজেটে রাজস্ব আদায় ধরা হয়েছিল ৫২ হাজার কোটি টাকা। বছরের প্রথম দিকে সাধারণত আয় কম থাকে। শেষ দিকেই আয় বেশি হয়. তার উপর এবার নির্বাচন থাকায় প্রথম ত্রৈমাসিকে তেমন আয় হয়নি বললেই চলে। রাজ্য সরকারের কর্তাব্যক্তিদের ধারণা ছিল, পুজোর পর থেকে যে রাজস্ব আদায় হবে, তাতে তা পুষিয়ে যাবে।

কিন্তু ৮ নভেম্বর নোট বাতিলের ঘোষণায় বজ্রপাতের মতো আর্থিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনাবেচা একেবারে বন্ধ। এই সেক্টর থেকেই ভালোরকম আয় হত সরকারের। এবার তাতেই বড় ধাক্কা লেগেছে। তবে কিছুটা মুখরক্ষা করেছে আবগারি শুল্ক বাবদ আয়। ১০০ দিনের কাজের টাকাসহ কেন্দ্রীয় বরাদ্দও আসছে না। এর উপর প্রতি বছরের মতো জানুয়ারি মাসে ডিএ ঘোষণা করতে হলে আর্থিক বোঝার দায় আরও বেড়ে যাবে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। তবে এক শতাংশ ডিএ দিতে হলে মাসে সরকারের খরচ হবে ২৫ কোটি টাকা। এই অবস্থায় কী করা যাবে, তা ঠিক করতে বৃহস্পতিবার বিকালে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র এবং মুখ্যসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠক করেন। কয়েকটি দপ্তরের বরাদ্দ কাটছাঁট করার পথে যেতে চলেছে সরকার। ইতিমধ্যে উন্নয়ন দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ২০৪ কোটি টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরও কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৯/১২/১৬)

স্বাস্থ্যভবন থেকে উধাও বাম আমলে প্রাইভেট হাসপাতালের সঙ্গে রাজ্যের চুক্তির সমস্ত ফাইল

গাফিলতি নাকি অন্য কিছু, দানা বাঁধছে রহস্য

বিশ্বজিৎ দাস, কলকাতা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু কলকাতাসহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেসরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমগুলিতে রোগীদের বিল আকাশছোঁয়া। নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্তদের সর্বস্বান্ত হওয়ার জোগাড়। এতে রাশ টানতে বিভিন্ন মহল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ এসেছে। সেইমতো উদ্যোগ নিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য দপ্তর। বিশেষত বাম আমলে সরকার জলের দরে যেসব কর্পোরেট হাসপাতালকে জমি দিয়েছিল, রাজ্যের সঙ্গে তাদের চুক্তিপত্র খুঁজে বার করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন স্বাস্থ্যভবনের আধিকারিকরা। তাঁরা চুক্তিপত্রগুলি দেখলেই স্পষ্ট হবে, কম দামে জমির বদলে গরিব মানুষকে কী কী সুবিধা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল বেসরকারি হাসপাতালগুলি। তারা সেই অঙ্গীকার কতটা পালন করেছে? আদৌ কি বা চুক্তি বা নিয়ম মেনে চলেছে? কতজন গরিব রোগী সেখান থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছেন?

খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে জানা গেল বিস্ফোরক তথ্য। স্বাস্থ্যভবন থেকে উধাও সেইসব ফাইল। সস্তায় সরকারের কাছ থেকে জমি পাওয়া বড় বড় বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মূল চুক্তিপত্রগুলির একটিও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে বেসরকারি হাসপাতালগুলির বেলাগাম বিলে রাশ টানা তো দূরের কথা, সস্তায় জমি পাওয়ার ফলে রাজ্যের মানুষের এইসব হাসপাতাল থেকে কম খরচে কী কী পরিষেবা পাওয়ার কথা, সেটা পারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাজ্য। আর এই অন্ধকারের মধ্যে পড়ে গিয়েছে রোগীরা। প্রসঙ্গত, ই এম বাইপাস, আলিপুর, সল্টলেকসহ বিভিন্ন জায়গায় হাসপাতাল বানাতে বাম আমলে জলের দরে জমি পেয়েছে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলাদা করে সরকারের চুক্তি হয়েছে। গোটা বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে সোমবার স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব তথা রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব (স্বাস্থ্য) আর এস শুক্লার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা (শিক্ষা) ডাঃ সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে জরুরি বৈঠক করেছিলেন। মঙ্গলবার এ বিষয়ে তিনি প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

সূত্রের খবর, একটি দুটি বাদ দিলে সরকারের কাছ থেকে সস্তায় জমি ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়া কলকাতাসহ রাজ্যের অধিকাংশ বড় বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম ছাড়পত্র পায় ২০০১ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে। পাকেচক্রে গোটা স্বাস্থ্য দপ্তরকে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভে নিয়ে আসার প্রক্রিয়াও শুরু হয় সেই সময়। ২০০৪ সালে সল্টলেকে চলে আসে স্বাস্থ্যভবন। প্রচুর ফাইলপত্র হারিয়ে যায় সেই সময়। সেগুলির কোনও খোঁজখবর এখনও মেলেনি। অনেকে বলেন, স্বার্থান্বেষী কিছু মহল কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাইলপত্র সরিয়েও দেয়। এখন প্রশ্ন হল, বেসরকারি হাসপাতালগুলির সঙ্গে সরকারের চুক্তির ফাইল এভাবে কায়দা করে সরিয়ে দেওয়া হয়নি তো? সেই সময়ে কর্মরত রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের এক প্রাক্তন আমলা এদিন বলেন, ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। চুক্তির ফাইলগুলি থাকার কথা সেক্রেটারিয়েটে, মেডিক্যাল সার্ভিসেস ব্লকে। ভালো করে খোঁজা হচ্ছে তো? তাছাড়া আলিপুর, সল্টলেক, ই এম বাইপাসসহ বিভিন্ন জায়গায় সরকারি সস্তার জমিতে হাসপাতাল করা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতি বছর সরকারকে জমির লিজ বাবদ ভাড়া দেয়। একটু খোঁজাখুঁজি করলে সঠিক তথ্য বেরিয়ে আসবে।

এ রাজ্যের যখন এই অবস্থা, তখন স্বাস্থ্য বেনারাতে বাঙালিদের অন্যতম গন্তব্য কর্ণাটক কিন্তু প্রাইভেট হাসপাতালগুলিকে চাপে রাখতে এবং রোগীদের বিলে রাশ টানতে আনতে চলেছে নয়া আইন। সূত্রের খবর, আউটডোর, ইনডোর, ছোট-বড় অপারেশন থেকে শুরু করে প্রাইভেট হাসপাতালে বেডভাড়া, পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবেতেই দাম বেঁধে দিতে চলেছে কর্ণাটক সরকার।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৮/১২/১৬)

মোদি চান উদ্ভাবনী বাজেট, পর্যটনের জোর

বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠকে করহ্রাসের কথা

মিত্রিতা সান্যাল, দিল্লি

বাজেটে উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে চান প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার নীতি আয়োগ আয়োজিত বৈঠকে তিনি বলেন, ফেব্রুয়ারির শেষে বাজেট পেশ হলে, অর্থনীতির ওপর তার বিরূপ প্রভাব ফেলে। বাজেটের টাকা মঞ্জুর হতে হতে বর্ষা এসে যায়। এটা কাম্য নয়। এজন্যই এবার বাজেট এগিয়ে আনা হয়েছে। অর্থনীতির একদল বিশেষজ্ঞের সঙ্গে এদিন বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকের পরে নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান অরবিন্দ পানাগড়িয়া জানান, কীভাবে করের হার কমিয়ে আনা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে মূলত পর্যটন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে জোর দেওয়ার কথাই উঠে আসে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং, রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু। দেশে যেভাবে কর্মসংস্থান কমে আসছে তা চাঙ্গা করতে কী কী পদক্ষেপ করা উচিত তার উপর বিশেষ জোর দেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই। তাঁর বক্তব্যে বিশেষ স্থান পায় পর্যটন ক্ষেত্র। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের দেশে ঐতিহাসিক স্থানের অভাব নেই। পর্যটন ক্ষেত্রকে চাঙ্গা করলে এটি কর্মসংস্থানে বড় ভূমিকা নিতে পারে। ভাল মাইনে টানবে দেশের যুব সমাজকে। এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। তার জন্য অবশ্যই যুবসমাজকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এ ব্যাপারে একেবারে স্কুল পর্যায় থেকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।' আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞরা একমত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। কিন্তু তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, যে স্কুলে শিক্ষকের অভাব রয়েছে সেই স্কুলে কীভাবে এই ধরনের শিক্ষার উন্নতি হবে? তাই সরকারের উচিত শিক্ষাক্ষেত্রে নজর দেওয়া। বৈদ্যুতিন শিক্ষার সাহায্যে সারা দেশের স্কুলেই আরও আরও উন্নতমানের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন বৈদ্যুতিন পরিকাঠামো। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, সরকারের উচিত অসংগঠিত কর্মীদের সংগঠিত করা। চীনে অসংগঠিত কর্মীদের সংগঠিত করে সুফল মিলেছে। আমাদের দেশে ৯০ শতাংশ কর্মী অসংগঠিত।

কৃষিক্ষেত্রেও দেশ যে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে তার কথাও আজ বৈঠকে আলোচিত হয়। বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাব, কৃষকদের জীবিকা উন্নয়নের জন্য প্রথমেই দেখা জরুরি, তাঁরা যেন নিজেদের উৎপাদনের সঠিক মূল্য পান। ২০২২-এর মধ্যে সরকারের উচিত কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা। তাঁদের যাতে বাজারে নিজেদের উৎপাদন সরাসরি বিক্রি করার স্বাধীনতা থাকে, সে চেষ্টাও করা উচিত। সরকার সারা দেশে আর্থিক লেনদেনে বৈদ্যুতিন পদ্ধতির প্রসার চাইছে। কৃষকেরা যাতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাঁদের টাকা পান সেদিকে জোর দিতে হবে।

আজকের বৈঠকে নোট বাতিলের বিষয়টি সরাসরি আলোচিত না হলেও কীভাবে সারা দেশে বৈদ্যুতিন আর্থিক পরিকাঠামো তৈরি করা যায়, যাতে স্বচ্ছ নগদের অর্থনীতি চালু করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজে আজ বিশেষজ্ঞদের আরও একবার জানান, নোট বাতিল সিদ্ধান্তের পাশাপাশি তাঁর সরকার বৈদ্যুতিন আর্থিক ব্যবস্থার ওপর জোর দিচ্ছে। যাতে কালো টাকা যা কি না সন্ত্রাসের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, তা একেবারেই বন্ধ হবে। এই নিয়েও বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাব সরকার যে মাথায় রাখবে তা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। বৈঠকে উপস্থিত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ কৃষ্ণ, সুর্য পাল সিং, বিজয়পাল শর্মা, পুলক ঘোষ, সুমিত বসু প্রমুখ।

—সৌজন্যে আজকাল (২৮/১২/১৬)

সিপিএম কর্মীদের বছরে দু'বার পরীক্ষা

এখন আর বছরে একবার নয়, সিপিএম কর্মীদের বছরে দু'বার 'পরীক্ষা' দিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। শুধু রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী বা রাজ্য কমিটির সদস্যদেরই নয়, সমস্ত পার্টি সদস্যকেই এই পরীক্ষা দিতে হবে। সংগঠনকে চাঙ্গা করতে ও সময়োপযোগী করে তুলতেই এই পন্থা। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর আগের সভাতেই রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র সদস্যদের হাতে একটি ফর্ম ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই ফর্ম পূরণ করতে হয়েছে সবাইকে। এভাবে নিজেদের যোগ্যতার পরীক্ষা নিজেরাই নিয়েছেন। সোম-মঙ্গল দু'দিনের রাজ্য কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন বিমান বসু। পার্টির সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতেও একই পদ্ধতিতে 'সেলফ অ্যাসেসমেন্ট' করেছেন সদস্যরা। যাতে নিজেদের দোষত্রুটি এবং খামতি নিজেরাই তুলে ধরেছেন সভায়। এবার রাজ্যের সমস্ত সদস্যের জন্যই এই পদ্ধতি চালু হচ্ছে। সিপিএম মনে করেন, ১৯৯২ সালে চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেস যে সংশোধনী পদক্ষেপের নির্দেশিকা দিয়েছিল তা কার্যকর হয়নি। হয়নি বলেই পার্টিকর্মীদের গুণগত মান এতটা হ্রাস পেয়েছে। আর তা হয়েছে বলেই এই মুহূর্তে রাজ্যে আইডেন্টিটি পলিটিক্সের সঙ্গে ঠিক যুঝে উঠতে পারছে না সংগঠন। কোচবিহারের সাম্প্রতিক ভোটের ফল তুলে ধরা হয়েছে এই প্রসঙ্গে। ঠিক হয়েছে, এদিন থেকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও চেকআপের মধ্য দিয়ে পূর্ণ সদস্যপদে উত্তীর্ণ করতে হবে ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে। আর যোগ্যতা যাচাই করতে হবে মূল্যায়নের ৫ দফা মাপকাঠির মাধ্যমে। এতদিন বছরে একবার পার্টির গঠনতন্ত্র মেনে নির্দিষ্ট ধারায় সদস্যদের যোগ্যতামান যাচাই করে সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করা হত। যে কাজ এই মুহূর্তে চলছে বলা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে ৫ দফা মাপকাঠিকে কঠোরভাবে আরোপ করতে হবে সমস্ত স্তরের কমিটিকে। এ জন্যই দু'দফা 'পরীক্ষা' ব্যবস্থা। প্রথমে সমস্ত সদস্যই নির্দিষ্ট ফর্মের মাধ্যমে নিজেরা জানাবেন তাঁর রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, গণসংগঠনিক যোগ্যতামান ঠিক কতটা। তার পর নির্দিষ্ট কমিটি তাঁর মূল্যায়ন করবে সারা বছরের কাজকর্মের ওপর।

প্লেনামের সুপারিশ অনুযায়ী ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই সমস্ত জেলাকে ত্রুটি সংশোধন অভিযানের রিপোর্ট পেশ করার কথা রাজ্য কমিটির কাছে। বেশিরভাগ জেলাই তা জমা দিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা-সহ বেশ কয়েকটি জেলায় শাসক দলের সঙ্গে আঁতাত ও গোপনে শাসক দলের হয়ে কাজ করা বেশ কিছু কর্মীকে চিহ্নিত করে বহিষ্কার করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু কমিটির নিষ্ক্রিয় নেতাকে সরিয়ে নতুন সক্রিয় মুখ আনার সুপারিশ রয়েছে। রাজ্য কমিটির অনুমোদন পেলেই তা কার্যকর হবে। জানুয়ারি মাসে রাজ্য কমিটি ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী স্তর থেকে এই ত্রুটি সংশোধন অভিযান শুরু হবে। এবং তা মার্চ মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ করার জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে রাজ্য প্লেনাম।

এই বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে না থাকলেও কথাপ্রসঙ্গে যেন নোটবাতিল ও ধর্মঘট প্রসঙ্গ তুলেছেন কিছু সদস্য।

খোদ বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুই সেদিন জানিয়েছিলেন তড়িঘড়ি ধর্মঘট ডেকে দেওয়াটি সময়োচিত হয়নি। তবু উত্তর দিলেন রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। বললেন, রাজনৈতিকভাবে এবং ইস্যুর গুরুত্ব বিচারে কোনও ভুল হয়নি। কিন্তু ধর্মঘট ডাকতে হলে সংগঠনকে যে পর্যায়ে নিয়ে যেতে হয়, তা আমরা পারিনি। তাই বলে ইস্যুতে কোনও ভুল ছিল না। আমরা যে সঙ্কটের কথা সেদিন বলেছিলাম, আগাম অনুমান করেছিলাম, আজ সাধারণ মানুষ সেই সেই বাস্তবের মুখোমুখি হচ্ছেন। ফলে মোদির নোট-কাণ্ড নিয়ে সার্বিক বিরোধিতা আগামীর চালাতে হবে। দু'দিনের রাজ্য কমিটির বৈঠক শেষে সোমবার তাই রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত হয়েছে, ১ থেকে ১০ জানুয়ারি নোটবাতিলে জনগণের দুর্ভোগ অবসানের দাবিতে পদসভা, মিছিল, অবস্থান, বিক্ষোভ হবে। শ্রমিক, কৃষক, জনগণের অন্যান্য অংশের দাবিদাওয়া নিয়ে প্রচার আন্দোলনও চলবে। নেতাজির জন্মদিন ২৩ জানুয়ারি রাজ্য জুড়ে দেশপ্রেম দিবস পালন করা হবে।

দু'দিনের এই রাজ্য কমিটির সভায় আলোচ্যসূচিতে ছিল শুধুই সংগঠন। স্বাভাবিকই সর্বভারতীয় ও রাজ্য সাংগঠনিক প্লেনামের নির্দেশ অনুযায়ী পার্টির সংগঠনকে কী করে আরও সুবিন্যস্ত করা যায়, তা নিয়েই সদস্যরা বলেছেন। বিশেষ করে কী করে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী, রাজ্য কমিটির সদস্যদের কাজকে আরও উন্নত ও ত্রুটিমুক্ত করা যায়, তা নিয়েই আলোচনা হয়েছে। গণসংগঠনের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা হয়েছে। সম্পাদকের দেওয়া রিপোর্ট নিয়ে রাজ্য কমিটির ৫০ জন সদস্য আলোচনা করেছেন। রাজ্য সম্পাদক স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, কোন দল কী, কতটা করল তার বিচার করার দরকার নেই। নিজেদের সংগঠনকে পোক্ত না করে তুলতে পারলে এই অবস্থায় যৌথ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে কী করে দল? এদিন সভায় সীতারাম ইয়েচুরি বলেছেন, নোটবাতিল নিয়ে মোদি সরকার একের পর এক নতুন অবস্থা নিচ্ছে। বিপুল প্রচার চালানো হচ্ছে। সরকারের পদক্ষেপের পেছনে প্রকৃত উদ্দেশ্য কী, তা জনগণের দুর্ভোগ নিয়ে বিরোধী দলগুলির ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম প্রয়োজন। কিন্তু আমরা চাই আলোচনা করে, নির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে এগোনো হোক। মোদি সরকার যতই বাগাড়ম্বর করুক, সরকারের ভ্রান্ত বিদেশনীতি ও কূটনৈতিক ব্যর্থতার কারণে ভারতই ক্রমশ সমস্যার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। মার্কিন রণনীতির অংশ হতে গিয়ে ভারতের জনগণের স্বার্থবাহী স্বাধীন অবস্থানের ক্ষতি করছে মোদি সরকার। এই প্রশ্নেও জনগণের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করতে হবে। আরএসএস-বিজেপি দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণতন্ত্রের কাঠামোটিতেই আঘাত করতে চাইছে। এই শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে সিপিএম এবং বামপন্থীদের।

—সৌজন্যে আজকাল (২৮/১২/১৬)

FURNISHED PAYING GUEST ACCOMMODATION IN SOUTH KOLKATA

Furnished room for rent available in South Kolkata near transportations and shopping complex. Very convenient location.

Phone # 718 591 9164. Cell 9175447900 email y2kdutta@gmail.com

MATRIMONIAL (পাত্র চাই)

Hindu Bengali Parents are looking for Hindu Bengali/Non-Bengali boy FOR Canadian 27 years 5ft 2 inch fair family oriented engineer girl.

Contact +1 647 993 9453 and/or partner.can@gmail.com

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের সভ্য হউন

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL

Tax-exempt, Non-profit Educational and Cultural Organization

Certification of Incorporation : 14309, NYS Department of Education.

IRSEmp.No.51-0180481

MEMBERSHIP FORM

Name: ______________________________

Spouse's Name: ______________________

Address: ___________________________

City: ______________State: ____ ZIP ______

Phone #: ___________ E-mail: ____________

Enclosed a Check / Money order (Payable to CAB): $ ____

Signature : ______________________Date: ________

Membership Fee:

[ ] US$ 25.00 (USA _ Annual)
[ ] US$ 250.00 (USA – Life)
[ ] US$ 35.00 (Canada – Annual)
[ ] US$350.00(Canada – Life)

PLEASE CHEK ONE:

NEW MEMBER: ☐

RENEWAL: ☐

MAIL TO: RANADEB SARKAR
346 YALE ROAD
GARDEN CITY, NY 11530

We are consolidators for Singapore, Qatar, China, Air Canada, PAL, Jet Airways, Air India, Singapore, Korean, Royal Jordanian, Asiana. Our New partner Gulf Airlines Preferred rates on Emirates, Northwest, Lufthansa. Come see our new office

12375 Bissonnet St Suite # B Houston, TX 77099-1273 ;

Tel: 888-811-5377; 281- 530-3000 Fax: 281-530-3798 ;

Email: camdentravel@aol.com

37th NORTH AMERICAN BENGALI CONFERENCE

July 7th to 9th 2017, Santa Clara Convention Center
Organized by Bay Area Prabasi, Inc. (www.prabasi.org)
PO Box 3613, Fremont, CA 94539

Email: info@nabc2017.com - Web: www.nabc2017.com

The conference returns in 2017 to Silicon Valley for the fourth time in, and NABC 2017 Silicon Valley attempts to further the purpose kindled a decade ago. This 37th edition of the conference organized by Bay Area Prabasi strives to offer more—unique and socially-adept contexts where you can blend, connect, share, and unwrap your senses! We've designed a medley of programs for you to indulge in starting with a fantastic lineup of performing, literary and creative arts and much more—business forum, fashion show, youth activities. And for the first time in the history of the conference, unique outdoor events leveraging the local outdoors and culture of the broader bay area.

NABC 2017 @ Silicon Valley is all about indulging in Bangaliyana 2.0 by blending Bengali tradition, heritage, and modernity. We welcome our patrons, guests, artists, members, and sponsors to NABC 2017.

Join us in this celebration and swathe in various shades of Bangaliyana—mouthwatering Bengali delicacies, soulful music, literature, dance, drama, films, ghoroa adda, ethnic shopping and much more.

Since it was first conceived in 1981, NABC has been bringing Bengali communities across the world together—culturally, socially, emotionally—and shaping our diverse perspectives and values, while keeping us tied to our core—Bangla

NABC 2017 Registration Overview

Manual Registration

Manual registration is available on our site. After downloading the form, please print it, fill the form out, write a check payable to "NABC 2017", and mail the check, along with the form, to: "PO BOX 3613, Fremont, CA 94539". Once we process the payment, we will send an email confirmation with a link to the Hotel booking.

Online Registration

The NABC 2017 online registration is a quick and simple process that covers every phase of online registration.

Registration Options

a) Standard Registration and Donor Registration Benefits which includes Hotel room in Marriot or Embassy Suites and Preferred Seating for all Performances.

b) Individual Sponsorship which includes room(s) at the Hyatt Hotel and 5 Meals.

Registration Badges

Registration badges will be issues at the Registration counter and corresponding hotels on July 6th 2017.

Badges will be non-transferable.

Adult and Children badges as well as Donor and Sponsor levels will be color coded.

4 years and below will not be issued any badges.

Cancellation and Refund Policy

All cancellations must be received in writing (via fax, e-mail or regular mail) on or before April 30th, 2017, in order to receive a refund, less a 10% processing fee. After April 30th 2017, cancelled registrations will not be refunded, nor applied to future conferences.

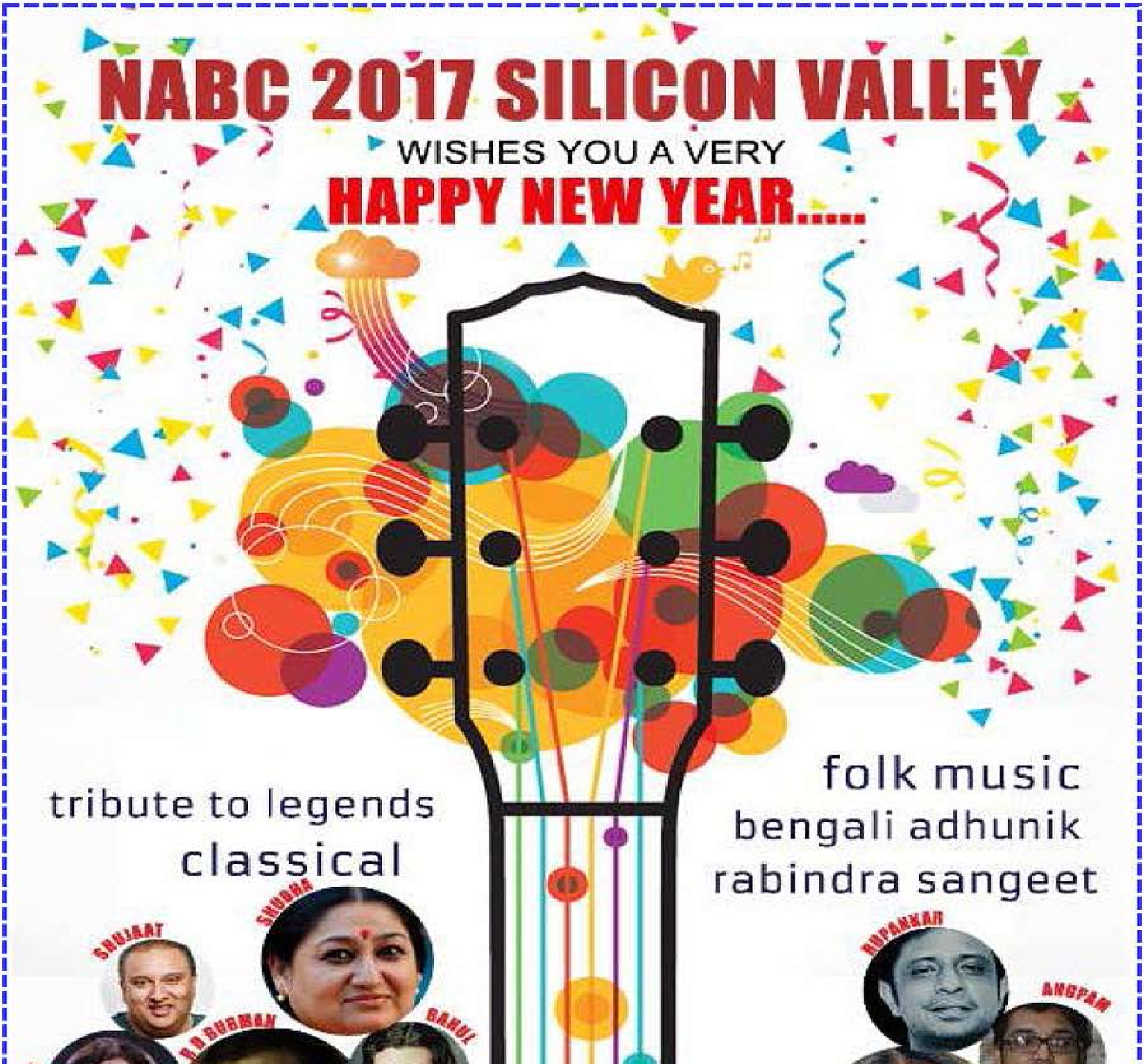

NABC 2017 invites Non-professional cultural groups! Deadline for application fast approaching Jan 31st.NABC 2017 encourages you to showcase your group's creative arts performance. Hurry, just a month left for application deadline - Jan 31st 2017! Letter of acceptance will be sent to the selected groups after Feb 25th, 2017.

Your participation gives back to your local cultural organization 15% of your total standard registration fee (min 30 registrations required)

বাবুলের দত্তক নেওয়া গ্রামে উন্নয়নই হয়নি

সুখেন্দু পাল, সালানপুর

'স্মার্ট' করে তুলতে ডিজিটাল ইন্ডিয়া গড়ার কথা ঘোষণা করে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অথচ তাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র দত্তক নেওয়া আদর্শ গ্রাম সিদাবাড়িতে যে সব অলীক কল্পনা মাত্র। ডিজিটাল হওয়ার দূরের কথা, সামান্য উন্নয়ন থেকেও অনেক দূরে সালানপুর ব্লকের এই গ্রামটি। তাঁদের কাছে জীবনধারণের ন্যূনতম সুবিধাটুকুও পৌঁছে দিতে পারেনি গাইয়ে মন্ত্রী। যথাস্বরূপ গ্রামে গিয়ে একাধিকবার বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। গত আটমাস ওই গ্রামমুখো হননি মন্ত্রী। অবস্থা এমন যে প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারত অভিযানের কোনও প্রতিফলনই নেই এই গ্রামে। সকাল হলেই লোটা হাতে মহিলা পুরুষ সকলকেই ছুটতে হয় মাঠেঘাটে, পুকুরপাড়ে। হাতে গোনা কয়েকটি বাড়িতে শৌচালয় রয়েছে। তা দেখে এলাকার অনেকেই টিপ্পনি কেটে বলছেন, খোদ মন্ত্রীর আদর্শ গ্রামে এই হাল দেশে ডিজিটাল হবে কীভাবে?

সংসদ সদস্য হওয়ার পরেই সিদাবাড়ি গ্রামটিকে দত্তক নিয়েছিলেন বাবুল। এই গ্রামে প্রায় ২৫০টি পরিবারের বাস। সালানপুর ব্লকের আছড়া মোড় থেকে বাঁদিকে চার কিলোমিটার গেলেই সিদাবাড়ি। গ্রামে অধিকাংশ মাটির বাড়ি। বাসিন্দাদের প্রধান পেশাই দিনমজুরি। তাঁদের অধিকাংশই এটিএম কার্ড কোনওদিন ছুঁয়েও দেখেননি। বহুজনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টই নেই। গ্রামে ব্যাঙ্ক নেই। সিংহভাগ মানুষের মোবাইলও নেই। মন্ত্রী দত্তক নেওয়ার পর উন্নয়ন বলতে গ্রামের শেষ প্রান্তে আধকিমির মতো একটি কংক্রিটের রাস্তা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকদের এনে জলাধারে কিছু মাছ ছেড়েছিলেন। তা কোনও কাজেই আসেনি গ্রামবাসীদের। অতএব পেটের টানে আজও দিনমজুরিই করতে হয় তাঁদের।

গ্রামের বাসিন্দা বাবুল রুদ্র বলেন, দিনমজুরের কাজ করি। আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই। যেটুকু টাকা হাতে থাকে তা বাড়িতেই রেখে দিই। এটিএম বা ডেবিট কার্ড কোনওদিন দেখিনি। মোবাইলও নেই। গ্রামের আর এক বাসিন্দা গণেশ বাউরি বলেন, আমরাও মোবাইল নেই যার চালাতেও পারি না। মোবাইলে টাকা লেনদেন হয় এই প্রথম শুনলাম। ওসব কি আমরা পারি? একই গ্রামের কাজল দত্ত বলেন, বাবুলবাবু গ্রাম দত্তক নেওয়ার পর অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তার কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। ১০০ দিনের কাজের জন্য কিছু লোকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হলেও তাঁদেরও অন্যের সাহায্যে টাকা তুলতে হয়। কার্ড দিয়ে লেনদেন করার দক্ষতা আমাদের নেই।

বৃদ্ধা অনুবালা দাস বলেন, গ্রামের মাত্র ২০-২৫ টি পরিবারে শৌচালয় হয়েছে। বাকি সবাইকে মাঠে যেতে হয়। সবাই বলছে মাঠে প্রাতঃকৃত্য করা ভালো নয়। কিন্তু বাড়িতে শৌচালয় তৈরি করার সামর্থ্য নেই। শুনেছিলাম শৌচালয় হবে। কিছুই হল না।

জানা গেল, গ্রামবাসীদের অধিকাংশ কাছে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা ক্যাশলেস জাতীয় শব্দগুলি সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাঁরা বাড়িতে টাকা রেখে লেনদেন করতেই বেশি স্বচ্ছন্দ। তাছাড়া কাছে থেকে চার কিমি দূরে গিয়ে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়া তাঁদের কাছে বিলাসিতা মাত্র। গ্রামের শেষ প্রান্তে গিয়ে দেখলাম মোবাইলের টাওয়ার উধাও। টু জি নেটও থমকে গেল। স্থানীয় এক কিশোর বলল, নেট করতে হলে আপনাকে উপর পাড়ার দিকে যেতে হবে। তাহলে বাড়িতে বসে মোবাইলে টাকা লেনদেন হবে কী ভাবে? উত্তর জানা নেই বাবুলের আদর্শ গ্রাম সিদাবাড়ির।

সৌজন্যে- বর্তমান-৩০/১২/১৬

তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করল মাদ্রাজ হাইকোর্ট

নতুন দায়িত্বভারের ঘোষণার পরে আম্মার প্রতি শ্রদ্ধা শশীকলার

তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করল মাদ্রাজ হাইকোর্ট। আদালতের কাছে জয়ললিতার মৃত্যুর সঠিক কারণ অনুসন্ধান কমিশন গঠন করার আবেদন জমা পড়েছে। সেই আবেদনের শুনানিতে এদিন বিচারপতি বলেন, তিনি প্রয়োজনে জয়ললিতার দেহ কবর থেকে তোলার নির্দেশ দিতে পারেন।

এআইএডিএমকে কর্মী পি এ যোশেফ আদালতের কাছে জয়ললিতার মৃত্যুর সঠিক কারণ অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত কমিটি গঠনের আবেদন করেছেন। বিচারপতি বিদ্যানাথন এবং বিচারপতি ভি পার্থিবনের নেতৃত্বে দুই সদস্যের অবকাশকালীন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি শুরু হয়েছে। শুনানির প্রথম দিনে বিচারপতি বিদ্যানাথন বলেন, সঠিক ঘটনা জানার অধিকার সকলের আছে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার মৃত্যু ঠিক কোন পরিস্থিতিতে হয়েছে, তা দেশের মানুষকে জানাতে হবে। তিনি আরও বলেন, মৃত্যুর পর একাধিক প্রশ্ন সামনে এসেছে। প্রশ্ন করার অধিকার সকলের আছে। আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে সন্দেহ হয়েছে। একদিন বলা হল, তিনি হাঁটতে পারছেন। অন্যদিন, তিনি বাইরে আসছেন এবং তারপর হঠাৎই মৃত্যু ঘোষণা করা হল। এখানেই প্রশ্ন, হঠাৎ করে কী এমন ঘটল? প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী এমজিআরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একাধিক ভিডিও প্রকাশিত করা হয়েছিল। রাজ্য সরকারের হয়ে এই আবেদনের বিরোধিতা করেন অ্যাডভোকেট জেনারেল মুথুকুমারস্বামী। তিনি বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুর পিছনে কোনও রহস্য নেই। এর পরই বিচারপতি বিদ্যানাথন বলেন, হাসপাতালে জয়ললিতার সঙ্গে আত্মীয়দেরও দেখা করতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু তাঁরা আদালতের কাছে আসেননি। আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী দেহ কবর থেকে তুলে যেন ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পক্ষে। কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে আদালতে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল মদনগোপাল রাও। তাঁর উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, আপনি সেখানে ছিলেন। কিন্তু কোনও রিপোর্ট দিতে পারেননি। আপনি সবকিছুই জানেন। কিন্তু কেন কোনও রিপোর্ট করেননি, তার কারণ আপনি ভালো জানবেন। নীরবতা বজায় রেখেছেন। একই সঙ্গে বেঞ্চ বলেন, আমরা সবাই সংবাদপত্রে দেখেছি যে, মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ হয়ে উঠছেন। পরে দেখলাম তিনি খাবার খাচ্ছেন, আকর্ষণ করতে পারছেন। এমনকী মিটিংও করতে পারছেন। কিন্তু হঠাৎই তিনি মারা গেলেন। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৯ জানুয়ারি করার আবেদন করেছে সিবিআই, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, আইন এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রক। আদালত কেন্দ্রীয় সরকারের আবেদনে সম্মতি জানিয়েছে। ৫ ডিসেম্বর চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান জয়ললিতা।

প্রয়োজনে দেহ কবর থেকে তোলার ইঙ্গিত

তাঁর মৃত্যু নিয়ে দলের মধ্যেই একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে সুপ্রিম কোর্টের কোনও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে তদন্ত করার আবেদন জমা পড়েছে মাদ্রাজ হাইকোর্টে। আবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২২ সেপ্টেম্বর হাসপাতালে 'আম্মা' জয়ললিতাকে ভর্তি করার পর থেকে অদ্ভুতরকম গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছিল। নির্দিষ্ট কয়েকজন ছাড়া কোনও আত্মীয় পরিজনকে তাঁর কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি। পুরো বিষয়টি অত্যন্ত 'সন্দেহজনক' বলে দাবি আবেদনকারীর।

সৌজন্যে – বর্তমান-৩০/১২/১৬

ইন্দিরার কাছে ছিল দল আগে, দেশ পরে, আর আমার কাছে দেশ আগে, দল পরে: প্রধানমন্ত্রী

দলকে বাঁচাতে দেশের কথা ভাবেননি ইন্দিরা গান্ধী। নরেন্দ্র মোদি এরকমই মনে করেন। ইন্দিরা গান্ধী ভুল করেছিলেন। আর তিনি সেই ভুল সংশোধন করে দেশের উপকার করছেন। আজ এই মর্মেই সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের শেষদিনে বিজেপি সংসদীয় দলের বৈঠকে তিনি নোট বাতিল সিদ্ধান্তের সমর্থনে ইন্দিরা গান্ধীকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন। কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধী থেকে মনমোহন সিং কেউই কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি জানিয়ে মোদি আজ দাবি করেছেন, যা করার দরকার ছিল তা আমিই করে দেখিয়েছি। দলীয় এমপিদের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালেই ইন্দিরা গান্ধীর সামনে সুযোগ এসেছিল নোট বাতিলের। ওয়াংচু কমিটির রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়। সেখানে বলা হয়েছিল কালো টাকার রমরমা রুখতে নোট বাতিল করা হোক। সেই সরকারের অর্থমন্ত্রী ওয়াই বি চ্যবন ইন্দিরা গান্ধীর কাছে প্রস্তাব নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন ওই সুপারিশ কি মানা হবে? তাহলে দেশের আর্থিক উন্নতি হবে। ওই কাহিনীর কথা আজ মোদি তাঁর দলের এমপিদের শুনিয়ে বলেন, ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সরকারের অর্থমন্ত্রীকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, কংগ্রেস কি আগামীদিনে ভোট লড়বে না? এর অর্থ হল ওই সিদ্ধান্ত নিলে যদি কংগ্রেস ভোটে হেরে যায়, এই আশঙ্কা থেকেই ইন্দিরা গান্ধী নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ভয় পেয়েছিলেন। মোদি মনে করেন, বেনামি সম্পত্তির বিরুদ্ধে আইন ১৯৮৮ সালে আনার পরও রাজীব গান্ধী বিল পাশ করাতে আগ্রহ দেখাননি। আমিই সেই বেনামি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে আইন এনেছি। গত ১০ বছরে মনমোহন সিং বিদেশে থাকা কালো টাকা ফিরিয়ে আনতে কোনও পদক্ষেপ নেননি। মোদি বলেছেন, আমি নিয়েছি। মোদি আজ বলেছেন, কংগ্রেসের কাছে পার্টি আগে। দেশ পরে। আমার কাছে পার্টি পরে, আগে দেশ। নোট বাতিলের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী আজ বলেছেন, গরিব মানুষের উন্নতির জন্যই এই সিদ্ধান্ত। একবার ক্যাশলেস ব্যবস্থা চালু হয়ে গেলে শ্রমিক, মজুরদের কোনও শোষণ আর হবে না। তাঁর আবেদন ডিজিটাল লেনদেনকে জীবনশৈলীতে পরিণত করুন দেশবাসী। তাহলেই এই দেশের উন্নয়ন সম্ভব।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৭/১২/১৬)

পেটের দায়ে অনলাইনের অ-আ শিখছেন অনেকেই

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল বহুবছর ধরেই। মাঝেমধ্যে গিয়ে টাকা জমা দেওয়া আর পাসবুক আপডেট করা ছাড়া ব্যাঙ্কের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না বছর পঞ্চাশের কাজল নস্করের। মাত্র কয়েক মাস আগেই মেয়ের সঙ্গে গিয়ে এটিএম থেকে টাকা তোলা শিখে এসেছিলেন। এখন আবার বিমুদ্রাকরণের বাজারে নতুন করে বিপদে পড়েছেন তিনি। কয়েকটি বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে সংসার চালান। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে কয়েকটা বাড়ি নগদের বদলে চেক দিয়েছে তাঁকে। ওই একদিন এক বেলা ছুটি নিয়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা করে টাকা তুলে এনেছেন।

বিমুদ্রাকরণের প্রথম ধাক্কা সামাল দিয়ে অনেকেই এখন চেষ্টা করছেন প্রযুক্তির সঙ্গে হাত মেলানোর। হুড়মুড় করে স্মার্টফোনে ডাউনলোড হচ্ছে পেটিএম, ফ্রিচার্জ, স্টেট ব্যাঙ্ক বাডির মত বিভিন্ন অ্যাপ। এই সমস্ত ব্যবহার করতে যে সকলেই খুব সাবলীল, এমনটা কিন্তু ভাবা ভুল হবে। অনেকেই খানিকটা বাধ্য হয়ে চেষ্টা করছেন প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলাতে। কখনও বাড়িতে ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনির সাহায্য নিচ্ছেন, তো কেউ আবার নিজে নিজে শিখতে গিয়ে করে ফেলছেন ভুল পেমেন্ট। তবে অনলাইন পেমেন্টে স্বচ্ছন্দ হওয়ার চেষ্টা করছেন না।

ডাক্তারের চেম্বারে নার্সের কাজ করেন নন্দী দাস। তাঁর মা আয়ার কাজ করেন। তাঁর সংসারে তিনিই প্রথম একটা স্মার্টফোন কিনেছেন। কারণ এই মাসে তিনি মাইনেটা নগদ টাকা পাননি। তাঁর মাইনে এসেছে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং-এর মাধ্যমে। এই নতুন ফোন থেকে তিনি ইলেকট্রিক বিল মিটিয়েছেন। যদিও এখনও মন থেকে অনলাইনে টাকা হাপিস হওয়ার ভয় যায়নি। তিনি এখনও পরিষ্কার জানেন না, যদি ভুল পেমেন্ট হয়ে যায় তাহলে কোথায় জানাতে হবে। কীভাবে ফেরত আসবে তাঁর টাকা অথবা আদৌ আসবে কিনা।

নাকতলার একটা অ্যাপার্টমেন্টে কেয়ারটেকারের কাজ করেন রবীন রায়। তিনিও ব্যবহার করতে শিখছেন স্মার্টফোন। তাঁর নিজের স্মার্টফোন নেই, ছেলের আছে। যে অ্যাপার্টমেন্টে তিনি কাজ করেন সেখানকার আবাসিকদের বিদ্যুতের বিল দেওয়ার কাজটা তাঁকে করতে হয়। এই মাসে অবশ্য সেই কাজটা তিনি অনলাইন করেছেন। সবার থেকে নগদ টাকা নিয়েছেন, যদিও বিলগুলো চুকিয়েছেন ছেলের স্মার্টফোনের ইন্টারনেটের মাধ্যমে।

শিয়ালদহ স্টেশনের চার নম্বর

অনেক মানুষই। কারণ নগদের সঙ্কট যে এখনই পুরোপুরি মিটছে না, সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে সবার কাছেই।

বছর পঁয়ষট্টির অলোক রায় বেজায় ঝামেলায় পড়েছিলেন প্রথমবার পেটিএম ব্যবহার করতে গিয়ে। অবসৃতদার ওই প্রবীণের মোবাইলে ভাইপো পেটিএম এবং এসবিআই বাডি অ্যাপ ডাউনলোড করে দিয়েছেন। কিন্তু বৃদ্ধ একবার ট্রেনের টিকিট অনলাইন কাটতে গিয়ে খুব বিপদে পড়েছেন। মোবাইল ফোনে আসা ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড কিছুতেই সময় মতো দিতে না পারায় টিকিটই কাটতে পারেন নি। সে যাত্রায় প্রতিবেশী এক তরুণ তাঁকে রক্ষা করেন। আবার একবার অনলাইনে মোবাইল ফোন রিচার্জ করতে গিয়ে ভুল নম্বরে টাকা ভরে ফেলেন। তবে তিনি জানালেন যে, সময় লাগলেও ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হচ্ছেন এই নতুন প্রযুক্তিতে। একদিক দিয়ে তাঁর সুবিধাও হয়েছে। বিদ্যুতের বিল দিতে, মোবাইল রিচার্জ করতে তাঁকে আর বাইরে বেরোতে হচ্ছে না।

প্ল্যাটফর্মে ঝালমুড়ি, চিপস এবং অন্যান্য মুখরোচক খাবারের দোকান রয়েছে রাজেশ কুমারের। দিন পনেরো হল তিনি পেটিএম ব্যবহার করতে শিখেছেন। যদিও পেটিএম ব্যবহার করা খদ্দের সংখ্যা এখনও বেশ কম। তাঁর মতে, মাত্র ৫ শতাংশ লোক সারাদিনে ই-ওয়ালেটে তাঁকে টাকা দেন। তবে অ্যাপ্লিকেশনের সুবিধাটা তাঁর সবথেকে বেশি পছন্দের। তাঁর মতে ধীরে ধীরে প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই ভাল। চাঁদনি চক বা কোলে মার্কেটের দোকানদারদেরও দেখা গেল কাড়মোছ করে অনলাইন পেমেন্টের সোয়াইপ মেশিনগুলি বের করে এনেছেন। প্রতিদিন নোট গুনতে অভ্যস্ত হাতগুলো এখন কার্ড সোয়াইপ করছে। চাঁদনি মার্কেটে সোয়েটার বিক্রেতা বিশাল রানা যেমন জানালেন, বছরে হাতে গোনা কয়েকবার হয়তো কার্ড সোয়াইপ করে কেউ দাম চোকাতেন। সেখানে আজকাল প্রায়ই মেশিনে দাম মেটাচ্ছেন ক্রেতারা।

সৌজন্যে – এই সময়

ভাঙতে বসেছে সমাজবাদী পার্টি, মুলায়মের পাল্টা ২৩৫ প্রার্থীর নাম ঘোষণা অখিলেশের

লখনউ উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের মুখে ভাঙতে চলেছে শাসক দল সমাজবাদী পার্টি। এবার সরাসরি মুলায়ম সিংয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আলাদা ২৩৫জন প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করে দিলেন অখিলেশ যাদব। ছেলে অখিলেশকে বাদ দিয়ে একতরফা ৩২৫ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান মুলায়ম সিং যাদব। একদিন পর নিজের পছন্দমতো প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। ফলে বাবা-ছেলে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়ে গেলেন ভোটের আগেই। রাজ্যের ৪০৩টি আসনের মধ্যে ৩২৫টির প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছেন এসপি প্রধান মুলায়ম সিং। এরই সঙ্গে ছেলে অখিলেশের আলাদা তালিকা সরাসরি বাতিল করেছেন। শুধু তাই নয়, পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে অখিলেশের সম্ভাবনাও খারিজ করেছেন। দলীয় সূত্রে খবর, বাবার কাছ থেকে এই আঘাতে মুষড়ে পড়েন অখিলেশ যাদব। ৫-কালীদাস মার্গে নিজের বাড়িতে সমর্থকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। পরে বাবা মুলায়ম সিংয়ের সঙ্গে কথা বলে নিজের অসন্তোষের কথা জানিয়ে দেন। কিন্তু ছেলের অভিমানে বাবার মন আদৌ গলেছে কি না তা এখনও জানা যায়নি। তাঁর পছন্দমতো প্রার্থীদের তালিকায়না রাখায় বাবার সামনে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অখিলেশ। এসপি'র প্রার্থী তালিকায় ১৭৬ জন বর্তমান বিধায়কের নাম আছে। কিন্তু তাঁরা অখিলেশ ঘনিষ্ঠ, সেই রকম একাধিক বিধায়কের নাম কাকা শিবপাল যাদবের তৈরি তালিকায় বাদ পড়েছে। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, মন্ত্রী রাম গোবিন্দ চৌধুরি, পবন পাণ্ডে এবং অরবিন্দ সিং গোপ। এদিন বিকেলে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে বৈঠকের পর বিধায়ক ইন্দল সিং জানান, অখিলেশ সম্ভবত তাঁর পছন্দ মতো প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারেন। মুলায়ম আমাদের রোল মডেল, তিনি আমাদের নেতা কিন্তু বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের মানুষ অখিলেশকে চাইছেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্নরকম ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আর এক বিধায়ক ব্রিজলাল সোনকার জানান, আমাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে প্রচারে নেমে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আমরা কেউ টিকিট চাই না। আমরা চাই না। আমরা চাই দল জিতুক এবং অখিলেশ হবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের স্বপ্ন ২০১১ সালে অখিলেশকে দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। শেষ পর্যন্ত রাতে সেই সম্ভাবনাই সত্যি হল। অখিলেশ নিজস্ব প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিলেন।

ছেলেকে বাদ দিয়েই ভাই শিবপালের তৈরি তালিকা প্রকাশ করেছিলেন এসপি প্রধান মুলায়ম সিং যাদব। একইসঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের সম্ভাবনাও খারিজ করে দিয়েছেন। অথচ, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আগ্রহী ছিলেন অখিলেশ। গত কয়েক মাসে কাকা শিবপালসহ ১০ জন মন্ত্রীকে নিজের মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিয়েছিলেন তিনি। ওই ১০ জন প্রত্যেকেই অখিলেশের সমালোচনা করার পুরস্কার পেয়েছেন। আগামী নির্বাচনে তাঁদের ফের টিকিট দেওয়া হয়েছে। নাম ঘোষণার সময় সুস্পষ্টতই ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি সাংবাদিকদের সামনে নিজের ক্ষোভ ভালো কাজ করেছেন। তাঁদের অবশ্যই টিকিট দেওয়া উচিত। এরপর রাতেই 'ছুরি কাঁচে পাকিস্তান নীতি' নিয়ে শিবপাল যাদবের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন নেতাকে বিভিন্ন কমিটি থেকে হেঁটে ফেলেন। যাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুরভি শুক্লা। উত্তরপ্রদেশের নির্মাণ পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন সুরভি। একইসঙ্গে

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন

আর চেপে রাখতে পারেননি। তিনি বলেন, নিশ্চিত জয় হবে, এমন অনেক ভালো প্রার্থীর নাম তালিকায় রাখা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে আমি এসপি প্রধানের সঙ্গে কথা বলব। তাঁকে বলব, কয়েকজন মন্ত্রী খুবই রাজকীয় নির্মাণ নিগমের উপদেষ্টার পদ থেকে বাদ দেওয়া হয় সুরভি শুক্লার স্বামী সন্দীপ শুক্লাকে।

সৌজন্যে বর্তমান ৩০/১২/১৬

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ

যেকোনও বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত জানাতে সংক্ষেপে চিঠি লিখুন। পরিষ্কার বাংলায় হাতে লেখা বা টাইপ করা চিঠি ই-মেল / স্ক্যান বা ডাকে পাঠান।

চিঠি পাঠানোর ঠিকানাঃ

email : dcha42@aol.com or
DILIP CHAKRABARTI
200 WINSTON DRIVE # 2920
CLIFFSIDE PARK, NJ - 07010

অনির্বাচিত লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়

মা মেয়ের আদালত

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়

ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠা বেয়ে নিম্নগামী আকাশে। মহাকাশে ..। আজ রাতটা বেশ গাঢ় ঘুম ভাঙতেই সাতষট্টির জীবনবাবুর চোখ জানালার দিকে। কাঠের জানালা গলে ঘরের ভিতরে সকাল। এক কাত ফিরে ভাবে, ... কতদিন পরে একটু ঘুমোতে পারলুম ...। এক দেড় মাস যে পুলিশের তাড়ায় ...! এ বন্ধু সে বন্ধুর বাড়ি ছোটাছুটি ...

বিছানায় হাতের নোয়া-শাঁখার বাজনা। পাশ ফেরে স্ত্রী মঞ্জু। পঞ্চাশ বায়ান্নতেই ভারী শরীর। তার ফরসা চোখ মুখে এখনও ঘুমের ঘোর। ভারত ভূভাগে পুত্র প্রসবিনী এক মা দেড় দু'মাসের মধ্যে আজ একটু বেশি ঘুমোতে পেরেছে ...।

সিলিং ফ্যানের হাওয়া। মঞ্জুর মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল। হাওয়ায় দু-এক গুছি চুল কপালে গালে কাঁপে। জীবনবাবু সে গুছি সরাতে গিয়ে থমকে যায়, না ...! ও যদি জেগে ওঠে ...! ক'মাস ধরে তো দুজনেই পোঁটলা পুঁটলি বয়ে জায়গা বদল করে আশ্রয় খুঁজেছি ...!

সকালের আলোয় স্ত্রীর এলোমেলো উদরের দিকে তাকায় জীবনবাবু, ওখানে শুধু তো খাদ্য খাবারের জায়গা নয় ...! শিরা উপশিরা গর্ভনাড়ি কত যত্ন থরেথরে সাজানো। জন্মাধার আগলানো ...!

কাছেই রাধাকৃষ্ণ মন্দির। মৃদঙ্গবাদ্যের সঙ্গে খাতন করতাল হারমনি সহযোগে সকালের নাম গান..

... জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী।

শ্রীরাধার প্রাণ ধন মুকুন্দ মুরারী ।।

হরি নাম বিনে রে ভাই গোবিন্দ নাম বিনে।

বিফলে মনুষ্য জন্ম ....

শেষ কথা জোড়াটা ধাঁ করে কানে লাগে। ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে জীবনবাবুর বুক ...। গা-ময় চিড়বিড়িয়ে জ্বালা। পেস্টটুকু নিয়ে দাঁতে ব্রাশ টানে। মুখ ভর্তি সাদা ফেনা বুকে ভেতর থেকে গলা বেয়ে কথাগুলো বের হয়, ... ছি! ধর্মপ্রতিষ্ঠান অসৎ মা বাবা ...। মা নাকি আবার হাই স্কুলের দিদিমণি ...! সত্যি কি ওই মহিলার সন্ত কিশোর কিশোরীদের শিক্ষা দেওয়ার অধিকার আছে এদেশের সামাজিক নীতি, মানুষের বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ...! পাশ করলেই কি মানুষ শিক্ষিত হয় ...!

পেস্ট ফেনায় মুখ ভর্তি। স্বস্তি পেতে থুক ফেলে। মুখ গহ্বর একটু খালি। কিন্তু বুকের ভেতরটা যেন ভারী ...! বারান্দায় গ্রিলের বাইরে হলুদ কলকের ঝাড়। পাশে তুলসীমঞ্চে পাতা মেলে তুলসী গাছটা।

আর একবার পেস্টের থুক ফেলে দাঁতে দাঁত পিষে জীবনবাবু বিড়বিড় করে, ওই দিদিমণি তো শুধু মেয়ের মা নয়, নিজের ছেলের মা ...। ওর ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে থার্ড ইয়ার ...! তবে ...! ওই দিদিমণি মেয়ের দেহে, মনে গোপন দুরারোগ্য রোগ লুকিয়ে, বিয়ের আইনে মেয়েকে বিয়ে দিলে আমাদের ছেলেটার সঙ্গে ...! ছেলেটা তো ওদের জামাই ...! আপনজন! তাকে কি আইনের বেড়ায় সুযোগ করে বলির পাঁঠা হিসাবে দেখছে ...! নিজের কন্যা যেমন সন্তান ... যুবক ছেলেটা তো কারুর সন্তান ...! নাকি ওই মা নিজের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেলের বিয়েটিয়ের জন্য ঘরের সম্মান ...! তাই কি ... ভাবতে ভাবতে বেসিনের জলে মুখ ধোয়। চোখে মুখে জল দেয় তবু ভেতরটা ধুয়ে যায় কই ...!

দুই

শোয়ার ঘরে টেবিলে মোবাইলে রিংটোন। মোবাইলটা হাতে নিয়ে এক ঝলকে নাম্বার ক'টি পরখ করে, আবার সেই কন্যাপক্ষ ... বেয়াইবাড়ির কেউ অচেনা নম্বর থেকে কল করছে না তো? সত্যি মিথ্যে করে যা কেস ... শাসানি ক'দিন ...! দারোগা বাবুদের নাম করে ক'জন লোক যা আতঙ্ক করেছিল তারা নয় তো ...! কত বড় বড় নেতা মন্ত্রীদের নাম শুনিয়ে মেয়ের মামা যে ভয় দেখাচ্ছিল! নেতা ...মন্ত্রীরা কিছু মানুষের হাতে ভয় দেখানোর ভূত বা শাসানোর জুজু হয় কেন? বা হতে দেয় কেন ...!

জীবনবাবু সবুজ বোতাম টেপে, হ্যালো-ও

— আমি অ্যাডভোকেট প্রসাদ গুপ্ত বলছি

— হ্যাঁ। বলুন স্যার

— কী ব্যাপার আপনাদের? আপনাদের স্বামী স্ত্রীর জামিন তো জেলা জজের কাছ থেকে তো পাইয়ে দিয়েছি। জানেন তো 'ফোর নাইনটি এইট এ' কেসের জামিন করাতে বেশ কষ্ট?

— হ্যাঁ স্যার কষ্টের। তবু করে দিয়েছেন

— এত আতুপুতু কেন?

— স্যার বলছিলাম কী, আমাদের তো হল। ছেলের ... জামিনটা? কখন কী হয়ে যায় ... অত দূর দেশে চাকরি ...

— অসুবিধে হবে না। ক'টা দিন পর জজসাহেবের কাছে আর্জি সাবমিট করব। আপনাদের কাছে মেয়ের ব্যাপারে যা মেডিক্যাল রিপোর্ট, ডাক্তারদের কমেন্টস, ছেলের অফিসের অ্যাটেন্ডেন্স স্লিপ আছে, আপনার বউমার ক্যানে ... উকিলবাবুর বানানো, বউমাদের বাপের বাড়ির মিথ্যে অভিযোগ, জজ ঠিক বুঝতে পারবেন।

জীবনবাবু আকাশের দিকে প্রণাম জানিয়ে মুখ বাড়ায়, জজসাহেব বুঝবেন স্যার ...? স্যার ... মেয়ের এইসব মেন্টাল রোগ যা দেড় দু'মাস অন্তর ভয়ংকরভাবে জেগে উঠত ... ইন্টারমিটেন্ট লুন্যাসি ... এ সবচাপা দিয়ে বিয়েটা সেরেছে মেয়ের মা। যিনি হাই স্কুলের দিদিমণি ...। ছাত্রছাত্রী পড়ায়। দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয়। মেয়ের ঠাকুমা দিদিমা মাসিরা যাদের অনেকগুলি ছোট বড় নাতি নাতনি সদ্য শিশু, তাঁরাও কত করে আশ্বাস দিল যে, আমাদের মেয়ে খুব সরল। মেয়ে ঠিক বিদেশে গিয়ে একলা সংসার করতে পারবে ... মানিয়ে চলতে পারবে। ইংলিশ মিডিয়ামে হিস্ট্রিতে এম এ। সাতাশ আটাশ বয়েস ... কেন পারবে না?

— এসব তো আপনি আগে বলেছেন। নতুন বউ হয়ে এক-দুমাসের মধ্যে এক দিনেই সাত আটবার আগুনে হাত পোড়াতে গেছে, গলায় তোয়ালে জড়িয়ে সুইসাইড করতে যাচ্ছে ..., এসব তো জানি?

— আপনি আমার উকিলবাবু, আপনি জানবেন না তো, কে জানবে স্যার?

উকিলবাবু হাতের ইঙ্গিতে থামায়, এবার আসল কথায় মন দিন — বুঝুন, মেয়ের বাড়ির উকিলের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে।

জীবনবাবু খাঁকপাকিয়ে তাকায়, স্যার প্রস্তাবটা কি ওদের পক্ষের উকিলবাবু আগে দিল?

— নয় তো কী? মেডিক্যাল রিপোর্টে তো মেয়ের 'মুড ডিস অর্ডার এন ও এস' আর 'রিপিটেড সুইসাইডাল অ্যাটেম্পট' এসব লেখা আছে। অতএব ওরা আগে আসবে না মানে? সেটা বলছিলাম ...

মোবাইলটার পর পর ক'টা কোঁত কোঁত শব্দ। মাথার উপর আকাশে ... না, মহাকাশে পরিষেবা বিন্যাসে গোলযোগ। কথা বন্ধ হয় মুঠি হাতে।

তিন

মহাশক্তির নামে বড় গেট। তলা দিয়ে গাড়ি রাস্তা। কেক পেস্ট্রি মোবাইল দোকান কাটিয়ে অটো থেকে নামতেই তোরণের গেট। সরু ঢালাই পথটার দু'পাশে লাল সাদা গুলাব ফুলের ঝাড়। শ্বেত পাথরের সিঁড়ি ধাপে ছুঁয়েছে। মন্দির চত্বরেই ছেলেরা মুহুরি রেজিস্টার থেকে মুখ তোলে, কাকে চাইছেন?

— প্রসাদ গুপ্ত পাঠালেন।

— ফোর নাইনটি এইট এ তো? বসুন, বলে সানমাইকা সাঁটা বেঞ্চ ক'খানা দেখায়। কয়েকজন মধ্য বয়স্ক মানুষ বসে। ওধারে মাঝবয়েসি মায়ের সঙ্গে ছাব্বিশ সাতাশের যুবতী। হাতে শাঁখা। কপাল খটখটে সাফ। জীবনবাবুকে দেখে মেয়ে মায়ের কানে ফিস ফিস করে, এও এক ছেলের বউয়ের বাপের বাড়ির টাকা কামানো পিশাচ, মানসিক নির্যাতনকারী শ্বশুর ...

মা তাকায় মেয়ের দিকে, আমারও তাই মনে হয় ...! দেখতে অবিকল তোর শ্বশুরের টুকলি ...

যুবতীর সামান্য তফাতে কাঁচা পাকা চুলে আধ ময়লা ধুতি জামায় মধ্য পুরুষ। মনটা খাঁকা করতে বলে, ওমা তোমাদের বাড়ি কোথায়?

— এই টাউনে।

— কোথায় বিয়ে হয়েছে?

— এই তো সাত-আট থানা স্টপেজ দূরে ...

— তার জন্যে মা তুমি এখানে?

— নিজের জন্যে। কেন বলুন তো?

যুবতীর মা অধৈর্য বলে, আপনি এখানে? জমি জায়গা? বাস্তুভিটে? মারামারি পার্টি পার্টি? নাকি বাড়ির ছেলেরা ছেলে দল পাকিয়ে পাড়ার মেয়ের উপর নোংরামি করেছে ...,

ভদ্রলোকের গলা নেমে যায়, সেটা হলে তো ভালো ছিল ...

— তবে, মায়ের চোখ লোকটির দিকে।

— আমার ছেলের শাশুড়ি তার মেয়েকে দিয়ে বলাচ্ছে জামাইকে, তুমি এবাড়ি ছেড়ে চলো। আমার মায়ের সল্টলেকে জোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট খালি পড়ে আছে। তোমার বাড়ি ছেড়ে যদি না যাও, থানায় জানাব তুমি জুলুম করে বাপের বাড়ি থেকে পঞ্চাশ হাজার, এক লাখ টাকা আনতে চাপ দিচ্ছ, মানসিক নির্যাতন করছে ...

ছাব্বিশ সাতাশের ফরসা যুবতীর গলায় আপনজনের সুর, কেন ...! ভদ্রমহিলার ছেলেটেলে নেই?

— থাকলেই বা। সে তো বউ নিয়ে একটু তফাতে ঘর ভাড়া করে নিজেদের মতো আলাদা থাকে ...

চার

কথার রেশ তখনও ...। ছেলেরা মুহুরি সামনে আসে, শোনেন, জীবনবাবু কে আছেন? ও ঘরে স্যার ডাকছেন।

জীবনবাবু এগোতেই ডাইনে নেম প্লেট, নিশ্চয় কেতন সাহিড়ি.

অ্যাডভোকেট ডিসট্রিক্ট জাজেস কোর্ট মাথার উপর সিলিং ফ্যানের হাওয়া। আলমারিতে আইনের মোটা মোটা বাঁধানো বই পর পর সাজানো।

মেয়ে পক্ষের উকিল সাহিড়িবাবু বললেন, আমার অনেক মক্কেল বসে আছে। সময় কম। দেখুন, মেয়ে যে সব গয়না ... অরনামেন্টস নিয়ে আপনার বাড়ি গেছিল, সেসব দিতে হবে যে ...

— স্যার ওসব একটাও আমাদের নয়। আমরা চাইওনি। যাকে চেয়েছিলাম, সেটা তো কঠিন মানসিক রোগগ্রস্ত ... বারবার সুইসাইড করতে যাচ্ছে। এভাবে নতুন ... সদ্য বিবাহিত এক ছেলের জীবন চলে?

— দেখুন এসব মেডিক্যাল ব্যাপার।

— স্যার পরে যখন মেয়ের মা বাবাকে ডাকা হল, এমন রোগগ্রস্ত মেয়েকে বিয়ে দিলেন একটা যুবক ছেলের সঙ্গে ...। তার জীবনটা নষ্ট করলেন? তাঁদের উত্তর, বড়রা

এরপর ২২ পাতায়

গ্রাম বিলসা'র দুটি ভুতের গল্প

ডঃ অজিত ঘোষ, দঃ ফ্লোরিডা

"অজিত-মামা, আজকে তা'হলে সেইভুতের-গল্পোগুলোই হয়ে যাক," —বাবুয়া আমাকে উদ্দেশ্য করে। বাবুয়া, আমার বন্ধু বিশুর বোন, সম্ভর ছেলে। সেই সুবাদে আমি তার মামা।

—"সেদিন তো শুধু ভুতুড়ে গল্পো বলেছিলেন। আসল ভুতের গল্প বলাটা বাকি ছিলরাত হয়ে গেল বলে। আজ অন্ততঃ সে-গুলো হয়ে যাক," —বলে বিশুর মেয়ে রূপাকে বল্লে,—"বুয়া, (বুয়া তার ডাক-নাম) আম-তেল দিয়ে চাট্টিখানি মুড়ি মেখে রাখ। আমি পটলদা'র ওখান থেকে গরম-গরম সিঙ্গারা নিয়ে আসছি, অজিতমামা, আপনি ততক্ষণ গল্পগুলো ভেবে ভেবে বানিয়ে রাখুন।" তারপর বিশুর স্ত্রী সজনীর দিকে ফিরে একই নিঃশ্বাসে বল্লে,—"মামিমা, তুমি পান সেজে রেখো; চা টা, খাবার পর খাবো। এখন গোটা পাঁচেক টাকা দাও দেখি। সিঙ্গারা-টিঙ্গারা কিনে আনি।"

টাকা দিয়ে গম্ভির গলায় সজনী বল্লে "সিঙ্গারা না পেলে,—কচুরি-টচুরি, ভাজা কিছু দেখে, গুনে আনিস, তবে অজিতদা আবার খেতে হয়। এখনকার সবকিছু unsanitary জিনিষ তো।"

বল্লাম—"তা আনো তোমার সিঙ্গারা—না, কী বললে; আর রূপা, তুমিও তেল-মুড়ির ব্যবস্থা করো। কিন্তু, ভুতের গল্পো এখন কী আর জমবে?

—"কেন? কেন?? কেন?" —বাবুয়া, রূপা আর সজনীর রেকারিং প্রশ্ন।

—"বাইরে আঁধিয়ে আসেনা, বিদ্যুত চমকানো নেই, মেঘ-ডাকা, ঝুপ-ঝাপ বৃষ্টি নেই; ভুতের গল্প জমবে কেন? তার তো একটা পরিবেশ চাই?" ওদের উৎসাহকে একটু কমাবার চেষ্টা করি, যদি আজকের গল্প-পর্বের বিষয়-বস্তুর-মোড় ফেরে।

বিশেষ কাজ হল না। ঘরের এক কোন থেকে সজনীর গলা শোনা গেল,—"খুব জমবে। বাবুয়া, তুই যা। রূপা,—চায়ে জলটা চড়িয়ে দিয়ে তেল-মুড়ির ব্যবস্থা কর, আর আমাকে পানের সাজটা দে-তো মা।" সজনী এক, একজনকে নরম, গরম, মিষ্টি আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ করে, খুঁটো থেকে এক-প্রাণ জড় পড়িয়ে আলগোছে খেয়ে মেঝেতে চেপে বসলো। মেঝেতে পাতা সতরঞ্চির ওপর আমি আর বিশু আধ-শোওয়া আমাদের মাথার কাছে দেওয়ালের দিক মেঝেও বিছানাটা 'রোল' করা। দরকার হলে সেটা আমরা বালিশের মতো ব্যবহার করি।

রূপা, মাকে পানের সাজ দিয়ে গেল রান্না-ঘরের দিকে। বাবুয়া বেরিয়ে গেল গরম মুখরোচক খাবার আনতে।

মিনিট-কুড়ির মধ্যেই বাবুয়া গরম-গরম সিঙ্গারা নিয়ে ফিরে এলো। এদিকে চা-রেডি। ঝাল-সিঙ্গারার সঙ্গে গরম-চা, এই combination মুখের মধ্যে একটা sensation এনে দেয়! ধীরে-সুস্থে সেটা আমরা enjoy করছি। আমার গল্পো শুরু করলাম।

—"এটি আমার জন্মস্থান বিলসরা গ্রামের ঘটনার গল্প।"

—"আমার বয়েস তখন বছর-দুয়েক, সেই বয়সের ঘটনা এটা। চোখ বুজে মনে-করবার চেষ্টা করলে অন্ধকারের মধ্যে flash light এ তোলা কয়েকটা ছবির মতো মনে পড়ে। কিছু-মা, বাবার কাছ-থেকে শোনা।

তখন আমরা গ্রামের বাড়িতে থাকি। একটা চৌকো বড় উঠোনকে ঘিরে গায়ে-গায়ে এক-পাঁচিলে জোড়া কতকগুলো দোতলা বাড়ি। এরই পূব-দক্ষিণ কোনে আলাদা আর একটা দোতলা বাড়ি, আমরা বলতাম 'নতুন বাড়ি'।

আমরা থাকতাম নতুন বাড়ির দোতলায়, বাবা, মা, দাদা আর আমি আমাদের পাশের ঘরটা—মেজ-মার (মেজ-জ্যাঠাইমার) মেয়ে-জামাইয়ের ঘর। জ্যাঠাইমার মেয়ের ভালো নাম ছিল নরেশ নন্দিনী। ডাকনাম—নরু। আমি তাকে ডাকতাম—দিদি, নরুদি।

আমি ঠিক জন্মাবার সময় মায়ের, বছর-দুয়ের মেয়েটি মারা যায়। তারই শোকে, আর তাই পরেই মা'র ভাঙা শরীর হয়ে বহুদিন মা শয্যাশায়ী ছিলেন। তাই, প্রায় জন্মের পর থেকেই আমি নরুদির কাছেই থাকতাম।

মায়ের মুখে শুনেছিলাম,—'আমার যখন বছর দেড়েক বয়স, নরুদির বয়স উনিশ-কুড়ি, তখন নরুদি small-pox হয়ে মারা যায়। আর সেইসময় থেকে আমায় সারাদিন নিয়ে থাকতো একজন বাউড়ি-ঝি, -আমার পঞ্চিদিদি।

শুনেছিলাম—নরুদিদি আমাকে ভীষণ ভালোবাসতো। সেই নরুদির এক সন্ধ্যের একটু-স্মৃতি, দু-একটু কথা ছাড়া তার সম্বন্ধে আর কোনো স্মৃতি আজ আর আমার নেই। শুধু মনে পড়ে নরুদি ছিল ছিপ-ছিপে লম্বা। মা, জ্যাঠাইমার চেয়েও লম্বা।

একদিন—আমার বছর দুই বয়সের সময়, বিকেলে, বাড়ির দুর্গা-মন্ডপের কাছে খেলা করছিলাম। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সাধারণতঃ খেলা থাকতে, থাকতেই পঞ্চিদিদি আমাকে রোজ আমাদের নতুন বাড়িতে ঢুকে দোতলায় দালানে আমাদের ঘরের দোরের সামনে ছেড়ে দিয়ে যেতো। সেদিন, সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে দেখে সে আমাকে নতুন বাড়ির নিচের ভেজানো দরজার সামনে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেলো। সে থাকতো বাউড়ি-পাড়ায়। ঘন তেঁতুল গাছ, আর সব গাছেও বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তাকে যেতে হয় অনেকটা পথ। আমি দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম। সেই বয়সে—মানুষ মারা-যাওয়া সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হয়নি।' মানুষটা কোন কারণে কাছে নেই'—এই টুকুই বুঝতাম।

দরজা দিয়ে ঢুকেই গোটা-তিনেক সিঁড়ি, এক, একটা প্রায় আমার হাঁটু সমান উঁচু। সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে উঠতে দেখলাম—দালানের চত্বরে নরুদি কাপড় ছাড়ছে, সাদার ওপর লাল-সবুজ ডুরে শাড়ি। আধো-অন্ধকারে তার সেই ছবিটি আজো মনে আছে।

নরুদির মুখের দিকে তাকাইনি, আমার মাথা তো তার হাঁটুর কাছে। হয়তো বলেছিলাম,—"দিদি, মা'র কাছে যাবো।" মনে পড়ে যেন নরুদি বলেছিল, "কাকিমা ওপরে, চল।" নরুদির পেছু, পেছু এবার একটু নিচু, নিচু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলাম; উঠে ঘরে গেলাম সেখানে মেঝেতে বিছানায় মা শুয়ে। মা জিজ্ঞেস করলেন—"তোকে ওপরে কে দিয়ে গ্যালো?" বললাম—"দিদি"। নরুদিকে আমি দিদি বোলতাম।

—"কোথায় দিদি?"

দোতলার দালানের ভেতর দিয়ে যে সিঁড়িটা ছাতে উঠে গেছে,—সেই দিকটা দেখিএয় দিলাম। বললাম—"ছাতে, দিদি ছাতে গ্যালো।" নরুদি তখন মাস ছয়েক হলো মারা গিয়েছে।

শুনেছিলাম—যে সন্ধ্যায় দিদি আমাকে ওপরে মার ঘরের কাছে দিয়ে যায়, সে-রাতে আমার ভীষণ জ্বরে হয়,—১০৩ ডিগ্রি। জ্বরের ঘোরে খুব ভুলে বকেছিলাম।, আর মাঝে, মাঝে চমকে, চমকে উঠেছিলাম।"

আমার গল্পের বৈঠকের ঘরে সবাই একেবারে চুপ-চাপ, নিস্তব্ধ, বেশ কয়েক মিনিট। শুধু বাইরে রাতের ডাক। নিচের গলি থেকে বাচ্ছাদের গলা শোন যাচ্ছে। সজনীরই প্রথম তন্ময়তা ভেঙ্গে কথা বল্ল, —"অজিতদা, এ আপনার খুবই ছোটো-বেলার ঘটনা। সঠিক কাকে দেখেছিলেন বলা শক্ত। হয়তো স্বপনে-টপনে দেখে থাকবেন।"

বিশু, তার আধ-বোজা চোখ না-খুলে ভারি গলায় বল্লে,—"অজিত, তোমার ঝুলিতে বড়ো-বেলারও ঘটনা কিছু থাকে তো তাই বের করো।"

—"তাই করব ভায়। এর মধ্যে আমাকে এক মিনিট সময় দিন। আমি চায়ের জলটা বসিয়ে দিয়েই আসছি তারপর গল্পো শুরু করবেন,"—বলে রূপা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেই ভালো, গলাটা আমারো শুকিয়ে উঠেছে।

চা-বিস্কুট এলো দ্বিতীয় দফায়। আস্তে, আস্তে চায়ে কয়েকটা লম্বা চুমুক দিয়ে আমার গল্পো আবার শুরু করলাম। বাইরে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ঘরে এক-উইক ল্যাম্পের আলো।

—"আমার বয়েস তখন বছর ষোল। ম্যাট্রিক পাশ করার পর এক বছরও পড়াশোনা বন্ধ ছিল। বাবা-দাদাকে বৈঁচি স্টেশন বাজারে—তেল, ঘী, বেসন, ভুষী, মশলা-পাতির একটা দোকান খুলে দিয়েছিলেন। সেখানে রোজ বসি। বৈঁচি স্টেশন বাজার আর বিলসরা গ্রামের বাড়ি, চার মাইল রোজ সাইকেলে যাই আর আসি।

বৈঁচি-বিলসরা এর চার মাইল পথ বেশ নির্জন। পথের পাশে কয়েক জায়গায় কিছু বন-জঙ্গল; খানিকটা পথ একটা শ্মশানের পাশ দিয়ে। বাদ-বাকি খোলা মাঠেও ওপর দিয়ে। স্টেশন থেকে আমাদের গ্রামের দিকে প্রথম দু-মাইল খোয়া বাঁধানো। বাকি দু মাইল, গ্রাম পর্যন্ত রাস্তাটা মাটির পথ। বর্ষায় ঐ মাটির রাস্তায় গরুর গাড়ির চাকায় দুদিকে খালের মতো হয়ে যেতো। সে দু-টোকে গাড়ির লিগ। ঐ দুটো লিগের মাঝের একটু উঁচু জায়গায় লোকের পায়ে, পায়ে একটা সেড়—দু'ফুট চওড়া চলার পথ তৈরী হতো। ঐ পথটা ওপর দিয়ে আমরা সাইকেল চালাতাম। সাইকেল আসছে দেখলে, কী সাইকেলের বেল (Bell) শুনলে—চলতি-মানুষ রাস্তার যে কোন একটা ধারের পাড়ে উঠে সাইকেলকে যাবার জায়গা ছেড়ে দিতো।

বৈঁচির বাজারের দোকান-পাট বৃহস্পতিবার বন্ধ থাকতো। সপ্তাহের আর সব দিন,—রবিবারেও দোকান খোলা থাকতো। আমরা, যারা নানা ব্যবসায়ে জড়িতো, তারা অন্ততঃ, দুই, তিন, চার জনের দল করে সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরতাম। একা যদি কেউ ফিরতাম তো বিকেলে বেলা থাকতে বৈঁচী থেকে বেরিয়ে পড়ে সন্ধ্যে নাগাদ গ্রামে ঢুকে পড়তাম, প্রধানতঃ পথে ছিনতাই হবার ভয়ে। আমাদের অনেকের সঙ্গে দোকানের সারাদিনের বিক্রির ক্যাশের টাকা থাকতো। বৈঁচীতে তখন তো ব্যাঙ্ক ছিল না। আর আশপাশের গ্রামে ডাকাতির কথা মাঝে মাঝেই শোনা যেত। তা ছাড়া অন্ধকারে একা-একা শ্মশানের পাশ দিয়ে যেতে আমারও গা-ছমছম করতো। তাই আমরা জনা-তিনেকের একটা দঙ্গল করে বাড়ি ফিরতাম।

যাইহোক, সেদিনটা ছিল রবিবার। দুপুরে আমার জেঠতুতো দাদা এসে বল্লেন,—"অজিত, তুই আমার জন্য অপেক্ষা করিস। ক্যাশ বন্ধ করে দুজনে একসঙ্গে বাড়ি ফিরবো।" দাদার বৈঁচীতে ধানের আড়ৎ।

শীতের দিনে সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসে একটু তাড়াতাড়ি। সন্ধ্যে হয়, হয়, এমন সময় বড়দার দোকানের এক কর্মচারী এসে জানালো—দাদা সে-রাতে বাড়ি ফিরতে পারবেন না। কেননা ওঁদের, ধানের আড়ৎদার দের একটা জরুরি মিটিং হবে। বড়দা মথুরের বলে এক আড়ৎদারের ওখানে আজ রাতে থেকে যাবেন।

মুস্কিলে পড়ে গেলাম! আমার রোজকার সঙ্গীরা কোনোরকমে বাড়ি চলে গিয়েছে। একাই আমাকে এখন ফিরতে হবে। এদিকে গাঢ় কুয়াশা নেমেছে। শীতকালে কখনো-সখনো এমনই হয়েই থাকে। 'দুর্গা!' বোলে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তা জন-মানব শূন্য। কুয়াশায়, অন্ধকারে হাত দশ-পোনেরোর বেশী নজর চলে না। মাইল-খানেক রাস্তা 'হু হু', করে চালিয়ে আসবার পর একটু দূরে শিমুল গাছটা যেন দেখতে পেলাম। ওটা ঠিক শ্মশানের পাশে। ওরি পাশ দিয়ে রাস্তাটা বেঁকেছে। আমি তখন ঘামছি, শীতের সন্ধ্যের ঠান্ডা সত্ত্বেও।

বাঁক নিয়েই দেখলাম—আর দশ-বারো হাত আগে একজন সাইকেল চালিয়ে চলেছে। জোর ব্রেক কষে গাড়ির স্পীড কমিয়ে ফেললাম। তারপর ব্যালান্স সামলে নিয়ে সামনের লোকটির পেছু-পেছু সাইকেল চালাতে লাগলাম। লক্ষ্য করেছিলাম—সামনের লোকটির সাইকেলের পেছনের মাড-গার্ডের তলার দিকের আধ হাত-টাক জায়গা সাদা, আর তাতে একটা গোলমত রিফ্লেক্টর বসানো। নতুন সাইকেলে তখন ঐরকম থাকতো। ঐ-টুকুই নজরে রেখে সাইকেল চালাচ্ছি।

কুয়াশায়, অন্ধকারে তার দেহ প্রায় দেখতে পাচ্ছি না। শুধু একটা outline এর মতো, কখনো তাও দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু তা না পেলেও, সে গুন, গুন করে গান গাইতে-গাইতে চলেছে, তার অস্পষ্ট সুরটা শুনতে পাচ্ছি। অচেনা সুর, আর আমাদের দুজনের দূরত্ব বাড়া-কমার সঙ্গে তার সুরের আওয়াজও কম-বেশী হচ্ছে। তা হোক, তার খুব কাছে যেতে চাই না। কেন না খারাপ রাস্তায় খানা-খন্দকে সে একবার ব্রেক কষলে তার ঘাড়ে গিয়ে পড়তে পারি। একটা accident হয়ে যেতে পারে।

যাই হোক খুব ভরসা পেলাম যে সামনে আর একজন পথের সঙ্গী আছে, তা তাকে জানি, আর নাই জানি। এবার সোজা রাস্তা। মাইল খানেক গিয়েই আমাদের গ্রামে ঢুকে গিয়েছে।

ঘ্যাচাৎ-ঘ্যাচ্!! প্রাণপণে দুটো ব্রেকই কষলাম, সামনের কুয়াশার অন্ধকারের মধ্যে একটা লোক কখন এসে পড়েছে! প্রায় তার ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়েছিলা' ভাগ্যে লোকটি এক লাফে পাশে সরে গিয়েছিল। আর হঠাৎ থেমে যাওয়াতে আমিও balance রাখতে না পেরে গরুর গাড়ির চাকার 'লিগের খাদে' নেমে পড়েছিলাম।

'কে-রে?' —বলে চেঁচানি শুনেই চিনেছিলাম তাঁকে। বাবার বন্ধু বিশুকার গলা। দাদা চলেছিলেন সন্ধ্যে সাড়ে আটটার ট্রেন ধরে কলকাতায় বাসার যাবেন। তাঁর যা রবি-বারের রুটিন। —"দাদা আমি অজিত গো" —বলে গায়ের ধুলো ঝাড়তে লাগলাম। শুকনো-গলায় দাদা বল্লেন—"একটা সাইকেল লাইট—নিয়ে আসবি তো। কোথাও লাগে-টাগেনি তো?"

সে কথার উত্তর না দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, —"দাদা, আমার সামনের সাইকেলে ও লোকটা কে গেল বলুন তো?" বিশুকা আমাদের গ্রামের সকলকে আর আমাদের আশেপাশের গ্রামের বহু লোককেই চেনেন। অনেক দিন গ্রামের ইস্কুলে অনেককেই পড়িয়েছেন।

—"কোথায় কে গেল? আমি তো কাউকে যেতে দেখিনি। আমাকে তো পাশ-দিতে হবে, তবে তো সে যাবে। যা, সাবধানে বাড়ি যা," বলে বিশুকা স্টেশনের দিকে পা-বাড়িয়ে কয়েক সেকেন্ডে অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমার কানে তাঁর কথাগুলো বাজছে।

ঘোরটা চট্ করে কেটে গেল। কোন রকমে মেনেও খালের ওপর সাইকেল ঠেলে-ঠুলে, টাল-মাল, টাল মাল করে অতি কষ্টে balance করে সাইকেল চালাতে লাগলাম, বেশ জোরেই।...

গাঁয়ের কাছাকাছি এসে গেছি। দূরে গ্রামের রায় মশায়ের দোকানের আলো দেখতে পাচ্ছি। মনের ভেতর কথা হচ্ছে,—'সে লোকটাতো রাস্তা ছেড়ে মাঠে সাইকেল নিয়ে নেমে যেতে পারে না। তাহলে তো তাকে আমি পাশ করবার সময় আবছা অন্ধকারেও দেখতে পেতাম। হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কী করে? কে—সে?'

আমার বিশ্বাস—নরুদি এক সন্ধ্যায় আমাকে ওপরে মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। আর একজন আমার সামনে পথ-দেখিয়ে গ্রামের মুখে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু এরা মানুষ? ভুত? তোমরাই বিচার করো।" —আমি থামলাম। সকলে একদম চুপ চাপ। এমন সময়,—

—'ফু-স-সা!' ঘরে-বাইরে জমাট অন্ধকার। Load-shading হয়ে সব আলো নিভে গ্যাছে। পাখাটা আওয়াজ করে বন্ধ হয়ে গ্যালো। ঘরে ঘুটঘুটে

এরপর ২০ পাতায়

হোয়াইট-হাউসের গল্প

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, অস্টিন, টেক্সাস

হোয়াইট-হাউস হচ্ছে দ্বিতীয় মোনালিসা। আপনি মোনালিসা ছবিটার অনেকগুলি প্রতিকৃতি দেখেছেন। দেখে মনে হয়নি আপনার যে মোনালিসা ছবিটি একটা ব্র্যান্ডের নাম কিন্তু সেটা কিনা কোন একটা বস্তুর প্রতিকৃতি নয়, কেবলমাত্র একটা প্রতিভূ সৃষ্টি করা।

হোয়াইট-হাউস-এর ক্ষেত্রে লক্ষলক্ষ ছবি তোলা হয়েছে। অর্থাৎ ২০ ডলারের পশ্চাতে যে বাড়িটির ছবি ছাপা হয়েছে, ক্রীসমাস গাছে আর তাকে সাজানোর জিনিষপত্রের মাঝে, তোষকের কোণ্টের সজ্জাকারী বস্তু হিসাবে, স্যুভেনির কাপের মাঝে, লোগোর মাধ্যমে, রান্নাঘরের রেফ্রিজিরেটারের ম্যাগনেট গাত্রে, ক্যালেন্ডারের পাতাগুলিতে, জিগ-স পাজলের ভাঁজে ভাঁজে আর...কত আর কাকে সবার উপরেই আছে হোয়াইট-হাউসের মহিমার কথা।

যখন সত্যি সত্যি হোয়াইট-হাউসকে দেখবেন যে ওটা হচ্ছে ৫৫০০০ স্কোয়ার ফিটের বাড়ি, যাতে ঘর আছে ১৩২টা, জানালা আছে ১৪৭টা, ফায়ার প্লেস আছে ২৮টা, ৮টা আছে সিঁড়ি এবং ওঠা-নামা করবার জন্য ৩টে এলিভেটর। আপনি যখন প্রথম স্মৃতি মিউজিয়ামে ঢুকেছিলাম তখন একজন দর্শক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে আপনি মোনালিসা ছবিটি দেখতে ঢুকছেন তো? আর তেমনি এই ওয়াশিংটন শহরে ঢোকা মাত্রই আপনি খোঁজ করবেন আগে হোয়াইট-হাউসটা কোথায় আছে।

যদিও লোকে বলে যে হোয়াইট-হাউসটি Dublin তৈরী ১৮তম শতাব্দীর Lixenstar House এর মতো এবং এটির মধ্যে কান্ট্রি ম্যানর-এর ভাব আছে। যদিও ম্যানরটির ভাগে ভাগে বিভিন্ন ধাপের উপরে এবং বিশেষ করে উত্তর দিকে পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা আছে। আছে চারদিকের বেড়ার আড়ালে একটি ছোট্ট আকারের লন যার মধ্যে T.V. ক্যামেরার যন্ত্রপাতি এবং খবরাখবর আনার জন্য প্রতিনিধিদের দাঁড়াবার ব্যবস্থাও রয়েছে। এই ব্যাপার-স্যাপার দেখে আপনার মনে হবে এগুলির সমস্তটাই সত্য ঘটনার সাক্ষী নয়। সত্যঘটনার সাক্ষী হলো হোয়াইট-হাউসের ভিতরের কক্ষগুলি যেখানে দেশকে বাঁচাবার জন্য নীতি তৈরী হচ্ছে একবেঞ্চ জানালার পাশে তৈরী হচ্ছে অত্যর্মাতিধুকর কাজকর্মের কথা। এই অতন্দ্রীক্ষো কাজকর্মগুলি হচ্ছে সুন্দর পরিস্থিতির মধ্যে।

প্রেসিডেন্ট হ্যারী ট্রুম্যান বলতেন হোয়াইট-হাউসকে একটা বিরাট সাদা রঙের জেলখানা। মিচেল ওবামা, বর্তমান প্রেসিডেন্টে ওবামার স্ত্রী, বলেছেন যে বাড়িটি হচ্ছে সুন্দর খাঁচার মত বিশেষ। Kate-Bower বলে একজন সংবাদপত্রে লেখিকা বলছেন যে হোয়াইট-হাউস একটা ক্লাস-বিধানের মধ্যে বন্দী এবং পরিস্থিতির বাঁধনের মধ্যে আবদ্ধ যেটা একটা কল্পনার কান্ট্রি-ম্যানর। এই কান্ট্রি ম্যানরটি হচ্ছে টেলিভিশনের "ডাউনটাউনের "abbey" যেটার মধ্যে থাকে একটা প্রেসিডেনশিয়াল ফ্যামিলি আর থাকে তার চাকর চাকরাণীগুলো। যদিও আমি মনে করি যে শ্রীমতী বাওয়ার মুখের উপর চাকর-চাকরানী কথাগুলো বলতে চাননি। পরিবর্তে আছেন ৯৬টা ফুল-টাইমের এবং ২৫০ জন পার্ট-টাইমের Residence Staff। তিনি এই মিলনের সঙ্গে একটি মুভি "Gosford Park ২০০১ বা ১৯৭০ সালের ব্রিটিশ টেলিভিশন সিরিজের upstairs, down stairs মিল খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু এই মাস্টার-চাকরের বেনামীতে নাটক সৃষ্টি হয়েছে নানারকম। যেমন উঁচু নীচুর ঝগড়াঝাঁটি ও ক্লাশ-কনফ্লিক্টের উপস্থিতি আপনাকে একটু বিস্মিত করবে।

তার উপর হোয়াইট হাউস হচ্ছে ডাউনটাউন-abbey র একেবারে পাল্টা চিত্র। যেমন হোয়াইট হাউসের ফার্স্ট-ফ্যামিলিরা আসে এবং যান প্রতি ৪ বছর কিংবা আট বছর অন্তর অন্তর কিন্তু এই স্টাফগুলি বছরের পর বছরে একই থেকে যান। ৯ জন সদস্য এই সব সংসদের মধ্যে কাজ করছেন বেশ কয়েক বছর এইটাই প্রকৃত সত্য। ডাউনটাউন abbey তে গ্র্যান্ড থাম-রা (Grandthemn) থাকবেই বেশ কয়েক বছরের জন্য যদিও অন্য সারভেন্টরা আসে আর কখনো কখনো চলেও যায়।

"আমরা এখানে ভাড়ায় থাকি" একথাই বলেন আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ওবামা।" হোয়াইট হাউস হচ্ছে একখানা বাড়ি মাত্র কিন্তু থাকবার জন্য ঘর নয়। এখানকার যে ঘরগুলি টুরিস্টরা ঘুরে ঘুরে দেখেন সেগুলি হচ্ছে যেন বড়ো হোমের ঘর। যে ঘরগুলি বড্ড বেশি সাজানো গোছানো, বড্ড বেশি ফ্যাশনে ভরা কিন্তু Style কিংবা রুচির পরিমাণে খুবই কম। এক হিসাবে ঘরগুলিতে এক-প্রকারের সর্তহীন খানদানের ব্যাপার দেখা যায়, যেমনটি এয়ারপোর্টেও লাউঞ্জগুলিতে থাকে। কেবলমাত্র যখন President Kennedy রা যখন এখানে ছিলেন তখন হোয়াইট-হাউসকে তাঁরা একটু গ্ল্যামারাস দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন এবং বেশ খানিকটা সক্ষমও হয়েছিলেন। তাঁরা কনসার্ট ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা, বিভিন্ন ডিনারের মাধ্যমে বিভিন্ন উৎসবের রীতিনীতিটা মেনে চলতেন।

প্রেসিডেন্টরা যেমন পাল্টাতে থাকেন তখন এই স্টাফেরাই রুটিমাফিক ঘরদোর সাজায়। এই ধরণের রুটিনের মধ্যেই ঘর সাজানোর জিনিসের ইনভেন্টরিটি দেখাশোনা করে। এক্সিকিউটিভ চিফ ওয়াল্টার শীবের মতে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন সাহেবদের দুই আমেরিকান খাদ্য-তালিকার পরে তারা কিন্তু জানতো না বুশ প্রেসিডেন্টের খাবারের চাহিদা কি হতে পারে? কেবলমাত্র রাতারাতিই তিনি রান্নাবান্নায় দামী শাক-সব্জীর সাথে সাথে কেড-কারীর সংমিশ্রণ করলেন যেটা কিনা Tex-Mex-Chex র মতো ব্যাপার হলো।

ঘর সাজানোর খুঁটিনাটিও এই পছন্দের মতনই ছিল। তার মধ্যে বেশ খানিকটা রুচি মতন ব্যাপারও ছিল। হিলারী ক্লিনটনের শাম্পুর ব্যবহার, সূক্ষ্ম-ভাবে ন্যানসি রেগানের Limoges Boxes নাড়াচাড়া করবার অভ্যাস, জ্যাকলিন কেনেডির হারানো হ্যাম্পস্টার খোঁজা তার মধ্যেই পড়ে। লিনডন জনসনের অত্যধিক উঁচুতে টাওয়ারের জলের মধ্যে থেকে পাইপ চালানো। তিনজন ক্যালিগ্রাফারদের মধ্যে যার বিশেষ ধরণের ক্রিসমাস কার্ড তৈরী করেন এমন জায়গায় যে ঘরগুলোতে নতুন ফুল দিয়ে ঘর সাজানো হচ্ছে সেই ঘরগুলোই যে ঝাড়পোঁচ করা হবে সেইদিনই, সেটা কে জানে? ৩২৮ নম্বর ঘরে কেড-টা সাজানো ছিল একটা শক্ত ব্যাপার এবং সেগুলোকে মেনটেন করাই ছিল আরও শক্ত ব্যাপার। কেড সারভেন্ট Betty Finney যিনি ক্লিনটন এবং বুশ সাহেবদের সময়ে ছিলেন তিনি কাঁদছেন যে "কি করতে হবে তা জানতাম কিন্তু কাজ করতে গেলেই হৃদয় হিমশিম খেয়ে যেতাম।

এই শুনতেই খারাপ লাগছে, তাহলে এর চেয়েও কড়া কাজের বহর আছে আমাদের স্টাফেদের কাছে। তাঁরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনাবলীর উল্লেখ পাবেন স্বতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত ফরওয়ার্ড করা The buttler বইটির মাধ্যমে যেটি লিখেছেন Wil-Hay Good। কিংবা ১৯৭৯ সালের(3.), সিরিজের Back stairs-at White House by স্টাফার Lillian Rogers Park। এছাড়াও বই আছে যেমন J. B. West চীফ আসার J. B. West দ্বারা কিংবা Twenty-five-years in the White House by চিফ ফ্লোরাল ডিজাইনার Nancy Clark। কিংবা তা না হলে Dog-days at the White House প্রেসিডেনশিয়াল Kenn Keeper by Traphes Bryant ইত্যাদি।

এখানে ঘটনাগুলো পালাক্রমে তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন ফ্রান্সের রাঁধুনী বলছেন যে John Kennyedy সজ্জায় গৃহবারত প্রস্থীকে হুকুম করছেন যে জানলাটা খুলে দিতে। Barbara Bush বারকতক চেষ্টা করেও ঘরের কেড-সারভেন্টদের চিনতেই পারলেন না। কিংবা হর্সম্যান Linsday Little যিনি horschshoe খেলছিলেন স্বয়ং George H. W. Bush র সাথে এবং প্রায়ই জিতছিলেন, তিনিও তাকে চিনতে পারলেন না। Nancy Reagan একদিন কমপ্লেন করছিলেন একজন Florist র কাছে "এখানে একটা লাইট ছিলো না! যেটা আমি সুইচ টিপে জ্বালাতে গিয়ে দেখি জ্বলছে না বা জ্বলছে তখন আমি বলছিলাম যে ইলেকট্রিয়ানকে ডাকো! তারপর সেই ইলেকট্রিশিয়ানটা কিছুই করল না। না কিছু করেও Nancy Reagan তাকে ধন্যবাদ জানালেন অন্যমনস্কভাবেই।

যাঁরা এই ঘটনাগুলিকে ইম্পর্টান্ট বলে মনে করেন না তাহলে তাঁদেরকে বলি ১৪১ পাতার লেখা একটা অজ্ঞাত ঘটনা। বইটির চ্যাপটার পাঁচের Clinton শুরু হচ্ছে এই বলে যে "There was blood all over the President and First Ladies bed" কথাটি হচ্ছে একটা সুন্দর-কথার প্যাঁচ। এই রকমই কথার প্যাঁচ হচ্ছে আর একটি লাইনে "If it bleeds, it leads"। কিন্তু শ্রীমতী Bower জার্নালিস্ট হওয়া সত্ত্বেও এই লাইনগুলি পরে বই-এর বাইরে সরিয়ে দিয়েছিলেন না হলে বিশেষ শতাব্দীর মেয়ে পাঠকরা নির্ঘাত faint হয়ে যেতো!

"The blood flowed" হলো তখনই যখন Monika Lewinkey র প্রেম আড়ালটা চারপাশেই প্রকাশ হয়ে পড়লো। President Clinton বলেছিলেন যে তিনি বাথরুমের দরজাটা খুলে ঢুকেছিলেন। কিন্তু Staff Worker বেশি জানতো যে She clocked him with a book। ইতিপূর্বেই Clinton সাহেব যথেষ্ট আত্মজ-মেটিরিয়াল হড়িয়েছিলেন যেগুলি পূর্বেই যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। Usher Skip Allen কাঁদছেন যে ক্লিনটন সাহেবরা কখনই Full Resident Staff দের বিশ্বাস করতেন না। তাঁদের এই বিশ্বাসহীনতা কখনো কখনো স্টাফদের ফায়ারিং-এর সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারণ তাদের অত্যন্ত বেশি স্ক্যান্ডালের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। লিঙ্কনের বেডরুমে যাঁরা তাঁকে বেশি ডলার দিয়ে সাহায্য করবে তারাই রাত্রে থাকতে পারবে, হিলারী ক্লিনটনের মিস্টার ক্লিনটনকে উল্লেখ করা 'God damn bustard' বলে, মেয়ে চেলসির সিক্রেট সারভিস এজেন্টদের উদ্দেশ্যে বলা যে তারা হচ্ছে 'Pig' আর কিছুই নয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

ক্লিনটনেরা চরম Squalid কিন্তু Kennedy রা হলো Decadent অর্থাৎ পরাজিত সৈনিকের দল। President Kennedy তাঁর সেক্রেটারীদের সঙ্গে সাঁতার কাটবার সময় যে সমস্ত কীর্তি করেছিলেন সেগুলি হলো ভীষণভাবে অরুচিকর এবং অসামাজিক।

এইটাই হলো ওয়াশিংটনের মজার খেলা যে যে লাতে ট্রাম্পত্র সম্পর্কে কালোদের চেয়ার অনেকটাই ধরা পড়েছে হোয়াইট-হাউসের মধ্যে। ১৯৮৭ সালের সোভিয়েট লিডার মিখাইল গর্বাচেভের আসার কথা ছিল হোয়াইট হাউসের সাউথ লনে। কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেলো প্রচুর রকম। কালো Butter রা লনটাকে শুকানো করতে লাগলো একযোগে। Chief Usher Gary Walters এখানে বলছেন যে উনি একজন কালো লোককে হাতা খুলে মাথার উপর ধরতে কখনও দেখেন নি...।

দামী কাজের কাজেরাীরা হোয়াইট হাউস-এর হচ্ছে যথাক্রমে Usher, Florists, Executive Chiefs, Head House Keeper, Plumbers ইত্যাদিরা যাঁরা হলো সাদা চামড়ার। ডোমেস্টিক-জবরা যেমনটি Butters এবং Maid রা যাদের মধ্যে কালো চাড়েরই প্রাধান্য তারা কিন্তু সাদা চামড়ার কর্মচারীদের থেকে কম ডলারের মাইনেতে কাজ করে। প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁরা War On Poverty তে Union Address এ বলেছিলেন গরীবখানার প্রতি যুদ্ধ। জনসনের সময়ে Poverty Line ছিলো ৩০০০ ডলারের মতন। হোয়াইট হাউসের দুজনকে চাকরী দিয়েছিল সে সময়ে ২৯০০ ডলার / Per year মাইনেতে। তাই নিয়ে প্রেসমহলে কি ভয়ানক গন্ডগোল হল। মজার ব্যাপার যে সেই গন্ডগোলের ফলস্বরূপ কেড-সারভেন্টদের মাইনে বৃদ্ধি করে দেওয়া হলো ৩০০০ ডলারে।

হোয়াইট হাউসের অন্দরমহল হচ্ছে খুবই সাধারণ মাপের। এখানকার ছেলেমেয়েরা ড্রোপ খায়, কখন কখন লোকেদের বিয়ে হয়, কখনো কখনো বাচ্চাও হয়, হেড-চীফ আর প্রেস্টি চীফের মধ্যে ঝগড়া হয়, প্রেসিডেন্টদের ফার্স্ট-ফ্যামিলিরা আসে আর যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইবারে আপনাদের গল্প শোনাই যেখানে একজন সাধারণ কালো ব্যক্তি চাকর হিসাবে ঢুকেছিল ১৯৫২ সালে এবং তারপর একটা দিনও কামাই না করে কাজ করেছে বিভিন্ন তার মধ্যে বাটলারের কাজটাই সবচেয়ে দামী। তার মানে হলো ৩৪ বছর ধরে ৮টা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কাজ করা অর্থাৎ হ্যারী ট্রুম্যান থেকে প্রেসিডেন্ট রেগান পর্যন্ত তার পালা। এর মধ্যে সাক্ষী হিসাবে হোয়াইট হাউসের যে ইতিহাস তৈরী হয়েছিলো তার নাম Eugene Allen। এর মধ্যেই যে শুনেছিলো প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ারের সাথে ফোনে Arkansai Governor Arval Foubus র সাথে ঝগড়া করা। এবং তারপরে ফেডারেল ট্রুপ পাঠাবে বলেছিলেন যখন কালো ছেলেদের স্কুলে যেতে ক্ষুদ্রক্ষুদ্রতর্ক করার জন্য। প্রেসিডেন্ট কেনেডী দ্বারা ১৯৬৩ সালে One hundredth anniversary of emancipation proclamation করতে যেখানে অতগুলি কালো লোককে হোয়াইট হাউসে জমা হতে দেখেনি। তারপর Engene Allen শুনেছিলো Dallas এ প্রেসিডেন্ট কেনেডী আততায়ীর হাতে খুন হয়েছেন—যে খবরটা শুনে সমস্ত কালো অধিবাসীর সাদা-অধিবাসীদের সাথে সাথে খুব খুঁজে কেঁদেছিল। তারপর Engene Allen নিজ দায়িত্বে প্রেসিডেন্ট কেনেডির ছোট ছেলে "জন" এবং ছোট মেয়ে ক্যারোলিনকে সমবেত করে হোয়াইট হাউস লনে পার্টির ব্যবস্থা করেছিলো যাতে অমন দুর্দিনের মুখেও পার্টিটা কিছুটা হাসি এনে দিতে পারে।

প্রেসিডেন্ট জনসন কথাবার্তাতে সামান্য অভদ্র হলেও যখন Engene Allen এর একমাত্র ছেলে Vietnam র যুদ্ধে গিয়েছিল তার খবরাখবর নিতেন। Weekday তে প্রেসিডেন্ট ফোর্ড কখনো কখনো গল্প খেলতেন Langston গল্ফ কোর্সে যেখানে Engene Allen ও খেলতে যেতেন। Engene এবং প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের জন্মতারিখ একই ছিলো। First Lady Mrs Forel সেটা মনে রেখে প্রেসিডেন্টকে চমকে দেবার জন্য কেক পাঠাতেন খেলার মাঠে। ডাঃ মার্টিন লুথার কিং-এর সাথেও Engene র ফটো তোলা হয়েছিল যেমনটি হয়েছিলো পপ কিং মাইকেল জনসনের সাথেও। প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের সময়ে South Africa তে apartheid এবং Nelson-Mandela র মুক্তি বিষয়ে কথাবার্তা ওঠার সময়েও Engene Allen প্রস্তুত ছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী হেলেনকে সব প্রথম বাটলারের মধ্য থেকে invite করা হয় ১৯৮৬ সালে State Dinner Party তে। তারা সুসজ্জিত হয়ে হোয়াইট হাউসের সম্মুখ দরজা দিয়ে ঢুকেছিলেন, পেছনের দরজা দিয়ে নয়। জার্মানীর চ্যান্সেলর Helmut Kohl র সাথে Engene Allen হ্যান্ডসেক করছেন। তার চারপাশে নানা দেশের এ্যাম্বাসেডরেরা আছেন এই অবস্থার ছবি তোলা আছে।

এখানেই বাটলার Engene Allen র কাহিনী শেষ হবার কথা—কিন্তু হলো না তার কারণ ওয়াশিংটনে এলেন এক নতুন কালো রঙের

এরপর ১৯ পাতায়

শুধু কবিতার জন্য

দীপ্ত চক্রবর্তী, নিউ ইয়র্ক

সোশ্যাল মিডিয়ায় আজকাল প্রায়ই বাংলো কবিতা পড়ার সুযোগ হয়। হাতে পাওয়ামাত্র লাইক দিয়ে ছড়িয়ে দেয়া। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীজাত থেকে অনামী বা নাম না জানা কবির লেখা সবই। অনেকগুলো দুর্বল কাঠামোর মাঝে কবিতা। অনবদ্য লেখাও অনেক। তবু ভালো লাগে এই একুশ শতকের ডিজিটাল কম্যুনিকেশনের যুগে বাংলা কবিতা দিব্যি বেঁচে বর্তে আছে। বিশেষ করে যখন টেক্সট মেসেজ আর সেল টাইমের যুগে বাংলা চিঠিপত্র লেখার চল ও অন্তর্হিত।

নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে গর্বিত বাঙালির এক শতাব্দী প্রাচীন বাঙালি কবিকে বিশ্বকবি উপাধি দিয়ে পুজো করার চল অনেক দিনের। ঠিক তেমনি পুরোনোই বাঙালির আরেকটা ঐতিহ্য-বাঙালিদের মধ্যে কবিতা লিখিয়ের সংখ্যাটা, সে তুলনায় বাংলা কবিতার পাঠকের সংখ্যা অনেক কম। অনেকদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় অনুযোগ করেছিলেন, "আমাদের এতো কবি কেন", শক্তি বাংলার এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। অথচ সম্প্রতি আনন্দ পাবলিশার্সেও প্রাক্তন প্রকাশক বাদল বসুর আত্মজীবনী পড়ে জানলাম সব প্রতিষ্ঠিত কবির বইগুলোও খুব একটা বিক্রি হয় না। সেই কারণে পরশুরাম বা শিবরাম চক্রবর্তীরা বাঙালি ছেলের বয়ঃসন্ধির সাথে কবিতা লেখার প্রকাশের যোগাযোগ নিয়ে রসিকতা করেছেন। বাঙালি কবিতা লিখতে চায়, কিন্তু অন্যের প্রকাশিত কবিতা পড়তে চায় না। কিমাশ্চর্যম্।

কিন্তু বাংলা প্রকাশনার আদিযুগে যখন বাংলো গদ্য বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমের সাধু ভাষার সাথে হুতোম প্যাঁচার কথ্য ভাষার মারপ্যাঁচ করতে ব্যস্ত, তখন সাধারণ বাঙালি পাঠক কবিতার অনুরাগী ছিলেন। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের পাশাপাশি পরশুরামের পাঁচালি, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দরের কাব্য বাঙালিকে মুগ্ধ করেছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দে মাইকেল মধুসূদনের কবিতাও আদৃত হয়েছে। কিন্তু সময় যতো গড়িয়েছে, বাংলাগদ্য যতো শক্তিশালী হয়েছে, বাংলা কবিতার পাঠকও সংকুচিত হয়েছে। অথচ বাংলা কবিতাও সময়ের সাথে তার কাব্যভাষা আর ভাব বদলে আরো আধুনিক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যৌবন বয়সে লেখা কবিতার সঙ্গে ওঁর বুড়ো বয়সে লেখা কবিতার তুলনা করলে সে পরিবর্তন সহজে নজরে আসে। আর গত শতাব্দীর ত্রিশ চল্লিশের দশক থেকেই রবীন্দ্রনাথের অনুজ কবিরা তাঁদের সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করে এসেছেন। বিভিন্ন সময়ে বাংলা কবিতার আঙ্গিক থেকে তার সব কিছুকে নিয়েই বাঙালি কবিরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। এলিয়ট, ইয়েটস, রিলকে, আডেন নেরুদা ইত্যাদি সমকালীন বিদেশী কবিদের থেকে অনুপ্রাণিতও হয়েছেন অনেকে। কিন্তু বাংলা কবিতা যতো নতুনতর আধুনিক হয়েছে ততোই সাধারণ পাঠকের সাথে তার দূরত্ব বেড়েছে। সংস্কৃতিমনস্ক এলিট বা মুষ্টিমেয় পাঁচজন সে লেখার গুণগ্রাহী। একসময় কবিতাপ্রেমী বাঙালি আঁতেলরা নাকি দুই শিবিরে বিভক্ত ছিলো। বৌদ্ধরা ছিলেন বুদ্ধদেব বসুর গুণগ্রাহী, আর বৈষ্ণবরা বিষ্ণু দের লেখা কবিতার। প্রতিষ্ঠিত বাঙালি কবিরা দশকের পর দশক নতুন ভাবে কবিতা যেমন লিখতে চেয়েছেন, সে কবিতার নতুন পাঠক তৈরীর আগ্রহও তাদের কম ছিল না। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা পত্রিকা থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কৃত্তিবাস সে প্রচেষ্টাই করেছে। কবিতা পড়ার জন্য আন্দোলন হয়েছে। "কবিতা পড়ুন" লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে তরুণ কবিরা ক্যামেরার সামনে এসেছেন। কলকাতা ময়দানে একসময় পরিচিত অপরিচিত সব কবির স্বরচিত কবিতা পাঠের মুক্তমেলা হয়েছে। লিটিল ম্যাগাজিনে কবিতার সম্ভার সাজিয়ে কলকাতার বইমেলায় এসেছেন দূর দূরান্তের কবিরা। কবিতা প্রকাশনাতে চমক আনতে চিত্রশিল্পী নীরদ মজুমদারের ছবিতে সাজিয়ে এলো এক মলাটের নীচে শক্তি সুনীলের কবিতার বই। প্রতিষ্ঠিত আবৃত্তিকারদের কন্ঠে বাংলা আধুনিক কবিতা পৌঁছেছে শ্রোতার কানে দশকের পর দশক। সব সাহিত্য পত্রিকা এখনো কয়েক পাতা জুড়ে প্রবীণ নবীন অনেক কবির লেখা ছাপা হয়।

তবু পরিচিত অনেকের কাছেই আধুনিক কবিতা নিয়ে কটাক্ষ, অনুযোগ শুনেছি, "কারা যে এগুলো লেখে আর পড়ে? আমি তো মাথামুণ্ডু বুঝি না।" সত্যিই কি এতো প্রচারের পরেও আধুনিক কবিতার জনপ্রিয়তা নেই? কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তো রূঢ় গদ্যময় বাস্তবের কথা ভেবে কবিতাকে ছুটি দিয়েছিলেন অনেক আগেই। আবার জনপ্রিয়তা না থাকলে সোশ্যাল মিডিয়া, পুজোর সুভেনির বা ছোট পত্রিকা এখনো কবিতার এতো ছড়াছড়ি কেন?

আসলে কবিতা নিয়ে একটা সহজ কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। ছবি ভাস্কর্য, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, উপন্যাসের মতোই কবিতাও হলো একটা শিল্প-এখানে ভাব প্রকাশের একটা মাধ্যম। আর শিল্প কতটা জনপ্রিয় সহজবোধ্য হবে তা নিয়ে বিতর্কও বহু পুরোনো। সমারসেট মম্ প্যারিসের চিত্রকরদের নিয়ে লেখা "দ্য মুন এণ্ড সিক্স পেন্স" উপন্যাসে লিখে ছিলেন শিল্প যেহেতু মানুষের অনুভূতিরই প্রকাশ তাই সব মানুষই তার বোদ্ধা হতে পারে। সবাই সে মতো জানবেন না। যেমন সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায় লিখেছিলেন যে শিল্পকে সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জায়গায় নামানো যায় ন। সাধারণ মানুষকেই বরং, শিল্পের স্তরে উন্নীত হতে হবে। আবার যারা মাঝামাঝি একটা অবস্থানে বিশ্বাস করেন তারা বলবেন ভালো শিল্প মানে তার শিল্পসৌন্দর্য আর জনপ্রিয়তা দুটোই থাকতে পারে। যেমন চার্লি চ্যাপলিন বা সত্যজিৎ রায়ের অনেক জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের মধ্যেও কিন্তু অনেক গভীর অন্তর্দৃষ্টি বা বক্তব্য প্রচ্ছন্ন থাকে যা সাধারণ দর্শকের কাছে ধরা পড়ে না। অনেকটা সেরকম।

আধুনিক শিল্প দুর্বোধ্য না দুরূহতা নিয়ে বিতর্ক বহুদিনের। শুধু বাংলায় নয়। বিদেশেও। শুধু কবিতা নয়, চিত্রকলা, সাহিত্য, চলচ্চিত্রের আধুনিকতার নামে নানারকম "ইজম্" এর মোড়কে শিল্পীরা ইচ্ছে করে দুর্বোধ্যতা আমদানী করেন এই নিয়ে কটাক্ষ অনেক দিনের। আসলে আমরা সাধারণ মানুষ তত্ত্বকথার জটিলতা যত সহজে স্বীকার করে নিই, আমাদের গভীর অনুভূতি বা অবচেতন মনে জটিলতার প্রকাশ তত সহজে মেনে নিতে পারি না। তাই জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা বা জটিল গণিতের বই দেখলে সমীহ হয়। কিন্তু বিমূর্ত শিল্পকলা দেখে দুর্বোধ্য বলে গাল পাড়ি। রবি ঠাকুরের সহজ পাঠের কবিতা বুঝি। আর তার আঁকা ছবি দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খাই। তাত্ত্বিকভাবে জটিলতাই অনেক ক্ষেত্রে পাঠকের কাছে আধুনিক কবিতাকে আপন করে নেয়ার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তবে জটিলতা হলেই ভালো কবিতা হবে এমন কথা নেই।

আসলে মনের ভাব অনুভূতি শব্দ দিয়ে সাজিয়ে কিভাবে কবিতার সৃষ্টি হবে সেটা কবির একান্ত নিজস্ব। সে সৃষ্টি কবিতা হলেই চলবে। আর সৃজনশীল যে কোনো শিল্পীই যেমন দাবী করবেন তাঁর দায়বদ্ধতা শুধুই শিল্পের প্রতি, তেমনি কবিও দাবী করতে পারেন তাঁর রচনা শুধু কবিতাশৈলীর প্রতি দায়বদ্ধ, পাঠকের মনোরঞ্জনের প্রতি নয়। এখানেই একটা খটকা লাগে। কবি যদি পাঠকের কথা না ভেবেই কবিতা লেখেন তবে তাঁর লেখা পড়বেই বা ক'জন? অন্যদিকে পাঠককে ভালো লাগাতে গিয়ে সহজবোধ্য করার চেষ্টায় কবিতার মান বা সৌকর্য কমবে না তো? কোন কবিতা ভালো আর কোনটা মন্দ সেটা যাচাই করবেন কে? পাঠক? সেখানেও তো রুচির তারতম্য। আপনার যে কবিতা ভালো লাগল আমার তা নাও লাগতে পারে। আর ভালো কবিতা আলো কবিতা মানে যদি হয় সর্বজনগ্রাহ্য তবে তো জনপ্রিয়তাই হবে ভালো কবিতার বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। নাকি শুধু বিদগ্ধজনের পছন্দ অনুযায়ী বিচার হবে কোনটা ভালো আর কোনটা সাদামাটা কবিতা? এ বিতর্কের শেষ নেই।

তবু জনপ্রিয়তা বা ব্যক্তিবিশেষের পছন্দ অপছন্দ বাদ দিয়েও এক ধরণের কবিতাকে নির্দ্বিধায় বলা যায় বাজে কবিতা। বাজে কবিতা দুর্বোধ্য বা দুরূহ নয়। বাজে কবিতার কাঠামো দুর্বল আর ভাবের সূক্ষ্মতা থাকে না। মানে কোনো কাব্য গুণই নেই। বাজে কবিতা যারা লেখেন তারা অনেকেই কবি যশপ্রার্থী। আবেগের আতিশয্য আছে। অপরকে স্বরচিত কবিতা পড়ানোর লোভ আছে। অথচ কবিতা লেখার পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান নেই। এরা অনেকটা উৎসাহী স্বশিক্ষিত গায়কের মতো যারা বেসুরে বেতালায় গান গেয়ে আমোদিত হন। কিন্তু ছবি আঁকা বা গান গাওয়ার মতো কবিতা রচনারও একটা পদ্ধতি আছে। সেটা অনুশীলন করেই রপ্ত করতে হয়। যেমন শুধু অন্ত্যমিল থাকলেই ছন্দ হয় না। কিংবা শুধু টানা গদ্য লিখে ছন্দবর্জিত কবিতা হয় না। কবিতা তখন হয় যখন শব্দগুলো রবি ঠাকুরের ভাষায় কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলতে থাকে। যেসব কবি নতুন আঙ্গিকে শাস্ত্রবিরোধী কবিতা লেখেন তাঁরাও কিন্তু শাস্ত্র জেনেই তারপর শাস্ত্রের প্রথা ভাঙেন। এমন কি প্রতিষ্ঠিত বাঙালি কবিরাও ভালো কবিতা লিখতে নিবিড় অনুশীলন করছেন। যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায় আর জীবনানন্দ দাসের অপ্রকাশিত ডায়েরী, পাণ্ডুলিপিতে এই কবিতার পরিবর্তিত, পরিমার্জিত অনেক খসড়া দেখা যায়। ভালো কবিতা না পড়ে ভালো কবিতা লেখা যায় না।

আসলে আমাদের ছোটবেলা থেকে পাঠ্যপুস্তকে ছাপানো কবিতা পড়ে, মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় তার মেদবৃদ্ধির করার যন্ত্রণায় কবিতা নিয়ে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরী হয় না। পঙক্তি ধরে বিশ্লেষণ আর মানে বোঝার তাড়নায় কবিতার নিটোল সুন্দর অবয়ব, শব্দগুলোর মধ্যে লুকিয়ে থাকা কবির অনুভূতি কিছুই নজরে আসে না। জীবনস্মৃতিতে রবিঠাকুর লিখে ছিলেন ছেলেবেলার স্মৃতি, উদাত্ত কণ্ঠে না বুঝে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতে গিয়ে আবেগে চোখে জল আসার কথা। বলেছিলেন জীবনে না বুঝেও যে আনন্দ পাওয়া যায় তা বুঝে পাওয়া আনন্দের চেয়ে বেশি। কবিতা পাঠের আনন্দ অনেকটা সেরকম। কবিতা উপভোগ করতে গেলে তার মানে খুঁজতে হয় না। বরং লাইন ধরে তাৎপর্য বিশ্লেষণ রস আস্বাদনের ব্যাঘাত ঘটায়। সাজানো শব্দগুচ্ছের মধ্যে ধরে রাখা কবির মনের গভীরের অব্যক্ত অনুভূতিগুলোকে খুঁজে পাওয়া আর নিজের মনে অনুভব করতে পারাটাই কবিতা পাঠের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। তাই শেষ বিচারে কবিতা পাঠ, ভালো লাগা, তার সৌন্দর্য বিচার বা রসবিচার সবই আমাদের একান্তই ব্যক্তিগত।

কবিতা নিয়ে নিজের ভালোলাগার কথা ভাবতে মনে পড়ছে মেরীল্যান্ডের এক অচেনা রাস্তায় সন্ধ্যে নামার স্মৃতি। গাড়িতে চালানো সিডিতে ব্রততীর আবৃত্তিতে ছড়িয়ে পড়া কবিতার নির্যাস জনহীন নিসর্গের সাথে মিশে যাচ্ছে। কিংবা সেই কবে দোতলা বাসে বসে জয় গোস্বামীর দীর্ঘ কবিতা পড়তে পড়তে কখন বোম্বাই এর চার্চগেট থেকে ব্যান্ডস্ট্যান্ড পিয়র পৌঁছে গেছি বুঝি নি। আর অতি সম্প্রতি যখন এক বীর ভারতীয় সেনানীর দেশের জন শহীদ হওয়ার খবর মনকে নাড়া দিয়েছিল তখন শ্রীজাতর লেখা একটা কবিতা পড়ে মনে হয়েছিল আমাদের সবার আকো অনুভূতিগুলো কি নিপুণভাবে ঐ শব্দগুলোয় কবি ধরে রেখেছেন। শ্রীজাত নিজেই কিছুদিন আগে লিখেছিলেন জীবনে প্রথম শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা কবিতা পড়ে তাঁর নিজের অভূতপূর্ব ভালোলাগার কথা। আর শক্তি তাঁর জীবনানন্দ দাসের লেখা কবিতার প্রতি অনুরাগ গোপন রাখেন নি। এভাবেই আমাদের নিজের ব্যক্তিগত ভালোলাগার রেশ নিয়েই বাংলা কবিতা বেঁচে রয়েছে। বেঁচে থাকবে। মনে পড়ছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই অবিস্মরণীয় পঙ্ক্তি—"শুধু কবিতার জন্য আমি অমরত্ব অবহেলা করেছি।"

হোয়াইট-হাউসের গল্প

১৮ পাতার পর

প্রেসিডেন্ট যাঁর আবির্ভাব কালোদের কাছে অবিশ্বাস্য এবং দারুণ আনন্দে চমকিত করেছিল। তাঁর নাম প্রেসিডেন্ট ওবামা। প্রেসিডেন্ট ওবামা অনেক কারণেই বিখ্যাত তার মধ্যে Eugene Allen কে হোয়াইট হাউসে গেস্ট হিসাবে নিমন্ত্রণ করা (যেহেতু তার স্ত্রী তখন মারা গিয়েছেন)।

প্রেসিডেন্ট ওবামাই প্রেসিডেন্ট হবার বছরে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, ইরাকে ও আফগানিস্থানে যুদ্ধ বন্ধ করতে সাহসী হয়েছেন, কুবার সাথে প্রথম সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, ইরানীদের সাথেও প্রকাশ্যে মিতালী করে নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করেছেন। ভারতের সাথেও আমেরিকার সম্বন্ধ ১৯৪৭ সালের পরে এত ভালো হয়নি। এর জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী মনমোহন সিংএর অভ্যর্থনা হোয়াইট হাউসে বিদেশী আগন্তুকের মধ্যে সর্বপ্রথম হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ওবামার আমলেই ভারতের সাথে মেলামেশাটা এতদূর এগিয়েছিল যে Mr Michael and Mrs Michelle Salahi নামক ভদ্রলোক এবং তার স্ত্রী ভারতীয় ড্রেস পরে বিনা অনুমতিতেই হোয়াইট হাউসে ঢুকতে পেরেছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি এদেশে এসেছেন ৪ বার। ইংরেজীতে সমগ্র আমেরিকান কংগ্রেসএ বক্তৃতা দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ওবামাও ভারতে গেছেন শ্রী মোদির সময়ে দু-বার। বর্তমান নভেম্বর মাসের ইলেকশনে ডনাল্ড ট্রাম্প ও হিলারী ক্লিনটনের মধ্যে হচ্ছে। তার মধ্যে ট্রাম্প সাহেব যে রকম আবোল তাবোল বকছেন যে হিলারী ক্লিনটনই এই ইলেকশনে জিতবেন এইটেই আশা করি।

এই প্রবন্ধ লেখার আগে জানাই যে আমার সাথেও হোয়াইট হাউসের সম্বন্ধ হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ওবামাকে উদ্দেশ্য করে আমি একটা লম্বা চিঠি দিয়েছিলাম ভারত ও আমেরিকার যুক্ত সমস্যাগুলি নিয়ে। তার উত্তরে আমিও একটা লম্বা চিঠি পাই প্রেসিডেন্ট ওবামার কাছ থেকে একমাসের মধ্যে তার মধ্যে আমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন তিনি।

হোয়াইট হাউসের জীবন এমনিভাবেই চলে যায়। তার মাঝখানে ৪ কিংবা ৮ বছরের জন্য ফার্স্ট-ফ্যামিলিরা আসে আর যায়। কিন্তু বাকী সদস্যরা সবাই মিলে চেঁচামেচি করে এবং স্টাফেরা abets and abides। কত মানুষের গলার স্বর, হাসি কান্না, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সার সার হেঁটে যায় মিছি করে বহুবর্ণ স্মৃতির শতরঞ্চি মাড়িয়ে।

সূত্র—

Residence–Kate Andersen Brower

Butlar–Wil Haygood.

Camelots Court–R. Dallek

Gosford Park (2001)–

upstairs, downstairs

First Ladies–J.B. West

নববর্ষের আবাহন

দিলীপ চক্রবর্তী

২০১৬ সাল সব কিছু পিছনে ফেলে শেষ হয়ে এল। সময় তার নিজের গতিতে চলে, ভাবতে গেলে অবাক হতে হয় এইতো সেদিন নতুন বছরে পা রেখেছিলাম ২০১৬ সালে, আর এখনই ২০১৬ শেষ হয়ে এল আরেকটি নতুন বছর।

সংখ্যায় যা লেখা হবে ২০১৭ সাল। আর এভাবেই হতে চলেছে নববর্ষ ২০১৭ সালের শুভ বিতান। প্রতি বৎসর পশ্চিমবাংলায় যার শুরু হয় শঙ্খধ্বনির আবাহনে। এক শুভ আশার আলো নিয়ে। যার শুরু হয় আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের টাইমস্কোয়ারের 'Ball Dropping' এর মতো উত্তেজনাপূর্ণ আশার বাদ্য দিয়ে।

সেই নববর্ষের উত্তেজনা বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে নতুন দিগন্তে সূর্যের রক্তিম আভায় রাঙিয়ে তুলে ধরে আশার ডালি। বিগত বৎসরের হতাশা বা না পাওয়ার বেদনা মানুষ ভুলে যায় নতুন বৎসরের শুভাগমনের উত্তেজনার চোখ ধাঁধানো একরাশ উজ্জ্বল আলোর রোশনিতে। মানুষের মন আবার নতুন করে বাঁচার আশায় উজ্জীবিত হয়ে উঠে ভুলে যায় না পাওয়ার বেদনা, ভুলে যায় ক্রমাগত ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা। এ ভাবেই হৃদয়ের রক্তিম রঙিত রাঙানো আবীর দিয়ে বরণ করে নেবে ২০১৭ সালকে। নতুন আশায় বুক বাঁধার বাঁচার চেষ্টায় নিয়ে পদক্ষেপ নেবে নতুন বছরে। ২০১৭ সাল, সুস্বাগতম।

২০১৬ সাল নতুন আশার আলো নিয়ে এসেও আমাদের অনেক বেদনা দিয়েছে। এ বেদনা ও দুঃখের যেন পুনরাবৃত্তি না হয়—

এটাই সকল মানুষের কামনা। ২০১৬ সালেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সারা পৃথিবীতে একদল মানুষ মানবসভ্যতাকে নিঃশেষ করার প্রচেষ্টা করে গেছে। আমরা যারা মানবসভ্যতাকে প্রকৃত মূল্য দিয়ে উপভোগ করার চেষ্টা করি, সভ্যতাকে পালন করে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিতে চাই, তারা সকলেই নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করি। ২০১৬ উপহার দিয়েছে প্যারিসের কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদের হত্যালীলা, কুখ্যাত ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের আরেকটি লজ্জাজনক ঘটনা—Christmas Market অংশগ্রহণকারীদের উপর বড় ট্রাক চালিয়ে হত্যা করেছে বহু নিরপরাধ মানুষকে জার্মানির বার্লিন শহরে। হত্যাকারী আর কেউ নয়, জার্মানিতে আশ্রয় পাওয়া এক অকৃতজ্ঞ মুসলমান সন্তান।

পূর্ব ও পশ্চিমের দুই বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে দুটো যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে। যার একটি হল ভারতে কালো টাকা নিধনের জন্য ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল ঘোষণা, আর অপরটি হল কোন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও Donald Trump Hillary R Clinton কে হারিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। এরকম ঘটনা আমেরিকায় বিরল। এ ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। অপরদিকে ভারতের মুসলিম মহিলারা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন অমানবিক "তিনতালাক প্রথা" বাতিলের জন্য। ভারতের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলও সেই এ আন্দোলনে মুসলিম মহিলাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে, ব্যতিক্রম শুধু কলকাতার "তৃণমূল কংগ্রেস"। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী নেতাসহ নেতাকর্মীর সকলেই "তিনতালাক প্রথা" বাতিল করার বদলে সংরক্ষণেরই পক্ষেই রায় দেন। মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হয়েও এতবড় অবিচারের পক্ষে কেন সওয়াল করেছেন, সেটাই ভাবার বিষয়। কিউবায় 'বাতিস্তা সরকারের' পতন ঘটিয়ে কিউবাতে কমিউনিজম এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিপ্লবী নেতা ফিডেল কাস্ত্রো। ফিডেলের সাথী ছিলেন তাঁর ভাই রাউল ও চেগুয়েভারা সহ আরো অন্যান্য বিপ্লবীরা। অনেক আগেই চেগুয়েভারা বলিভিয়াকে স্বাধীন করতে গিয়ে আমেরিকান সৈন্যদের হাতে প্রাণ হারান। আর গত ২৫শে নভেম্বর কমিউনিজম ও রাজনৈতিক আকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তারকা ফিডেল কাস্ত্রো পরলোকে গমন করেন। এখন দেখা যাক কিউবার আকাশ থেকে কমিউনিজমের মেঘ চিরকালের জন্য কেটে যায় কিনা।

পুরাতন বছরের দুঃখ ও বেদনা থেকে আমরা সকলেই যেন শিক্ষা নিই। আর হত্যা নয়, হিংসা নয়, মানুষকে ভালোবাসতে হবে, সে যে ধর্মেরই হোক না কেন। ত্যাগকেই করতে হবে মূলমন্ত্র, নিজের প্রাণ দিয়ে অপরের প্রাণরক্ষার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তবেই হবে মনুষ্য জন্মের সার্থকতা।

আসুন, ত্যাগ সহনশীলতা আর ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞার ডালি নিয়ে ২০১৭ সালকে বরণ করি, তাহলেই নতুন বছর তার মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আমাদের সকলের জীবনকেই সাফল্য ও পরিপূর্ণতার জোয়ারে ভাসিয়ে দেবে।

আপনাদের সকলের জন্যই রইল ২০১৭ সালের শুভ ও মঙ্গল কামনা। আপনারা সকলে সপরিবারে সুখে থাকুন।

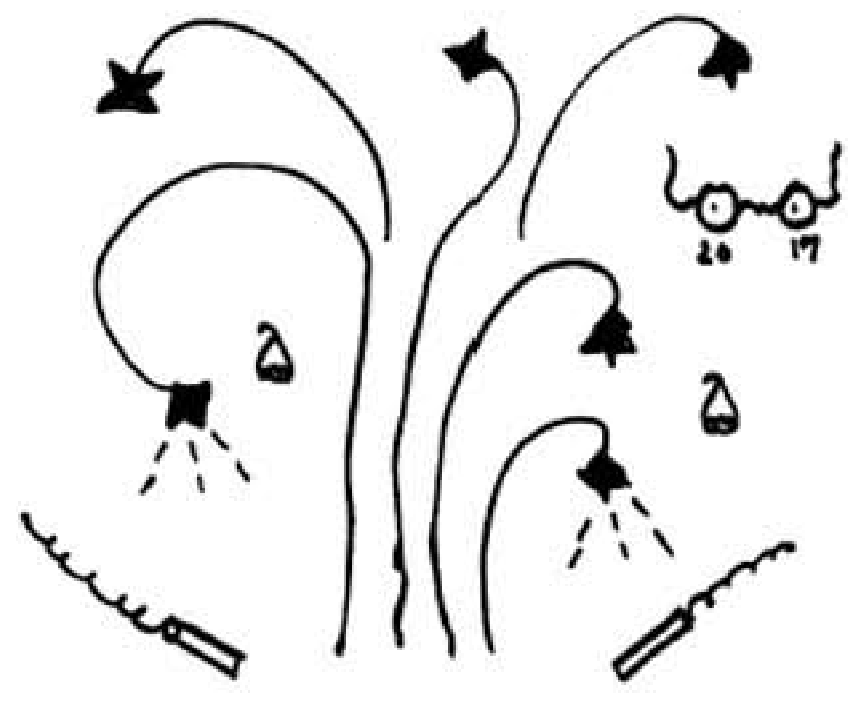

হ্যাপী ২০১৭

অরুন্ধতী সরখেল

হাতে বাঁশি মাথা টুপী
আলোর ফোয়ারায় হাঁসছে গুপী,
চোখে চশমা ঠোঁটে ঠোঁট
১-২-৩-২০১৭ গপ।

দুর্নীতি সাফ করবই: মোদি

প্রথম পাতার পর

সবটাই জানি আর তাঁদের হাতেনাতে ধরবও। বিরোধিতা এলেও তিনি যে সিদ্ধান্তে অটল রয়েছেন, তা স্পষ্ট করতে গিয়ে মোদি বলেন, এটি হল সাফাই অভিযান। দুর্নীতি আমাদের রক্তে মিশে গিয়েছে। তবে শুধু কালো টাকাই নয়, কালো মনের মানুষরাও দেশকে শেষ করে দিয়েছেন। তাঁদের চলে যেতেই হবে। তাঁর নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত দেশের সৎ মানুষকে শক্তিশালী করবে বলে মন্তব্য করে মোদি। তাঁর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করার জন্য দেশবাসীকে সাধুবাদ দেন প্রধানমন্ত্রী। বিরোধী নেতাদের কটাক্ষ করে মোদি বলেন, দেশবাসী তাঁর সঙ্গ না দিলে না জানি এরা কী করে ফেলত। এর আগে এদিন দিল্লিতে নীতি আয়োগের দপ্তরে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও মিলিত হন প্রধানমন্ত্রী।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৮/১২/১৬)

গ্রাম বিলসা'র দুটি ভুতের গল্প

১৫ পাতার পর

অন্ধকার; হঠাৎ একটা গুটি ভাব। রূপা অন্ধকারের মধ্যে রান্না ঘরে চলে গেল একটা লন্ঠন জ্বেলে আনতে। আমি হাতড়ে হাতড়ে বাইরের বারান্দায় বার হয়ে ছাতে উঠে এলাম। আকাশে তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে। ঐ তো সপ্তর্ষি। বিদেশে সপ্তর্ষি দেখতে পাই না। কী ভালোই লাগলো! ফোঁটা-ফোঁটা ছোটো, ছোটো তারারা জ্বলজ্বল করে যেন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে, ওদের মধ্যে কী নক্ষত্র আছে? আর সেই তারাটি?

নিচে আলো জ্বালা হয়েছে ওদের গলা শুনতে পাচ্ছি, ওরা আমায় খুঁজছে।—

—"অজিত কোথায় গেলে হে?" —বিশুর গলা।

—"অজিত কাকু", "অজিত মামা" —রূপা, বাবুরা হাঁক দিচ্ছে নিচের বারান্দা থেকে। না আর চুপ-চাপ থাকা নয়। সাড়া দিয়ে নিচে নেমে গেলাম। বিশু একটা টর্চ লাইট নিয়ে আমাকে আমার বাসায় পৌঁছে দিতে চায়।

দুজনে নিশ্চুপ পথ চলতে চলতে বললাম—"কী বিশু, আমায় না দেখতে পেয়ে কি সন্দেহ হয়েছিল সত্যিই আমি এসেছিলাম, না আর কেও?"

—"আরে, কী যে বলো"। —বলে বিশু তার কাঁধে রাখা আমার হাতটার ওপরে তার হাতটা বুলোলো। আমাকে স্পর্শ করে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে হয়তো নিশ্চিত হয়ে চাইছিলো? মুখে আরো কথা নেই। বাসার দরজা গোড়ায় এসে বলে—"চলি হে অজিত। কাল আবার দেখা হবে।"

রাস্তার, বাড়ির আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। বিশু বাড়ি ফিরে চলেছে—দেখতে পাচ্ছি ওকে। পথের কোণের বাড়ির পাশ দিয়ে বেঁকে যাবার আগে হাত-নাড়লো। ওর flash-light টা নেভায়নি তখনো। হয়তো ভুলে গিয়েছে।

ওর আর আমার মধ্যে অস্তিত্বের Beacon এটা।

এক নজরে

ভরসা সুষমার

নিউজিল্যান্ডে খুন হওয়া ভারতীয় যুবকের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। বড়দিনের পার্টিতে ক্রাইস্টচার্চে এক মহিলার ছুরির আঘাতে নিহত হন পঞ্জাবের যুবক হরদীপ সিংহ (২৬)। তাঁর দেহ ফেরাতে নিউজিল্যান্ডে ভারতীয় হাইকমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন বাড়ির লোকেরা। কিন্তু তাতে সুরাহা মেলেনি। টুইটারে বিদেশমন্ত্রী জানান, হাইকমিশনকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

বার্তা পাকিস্তানের

সন্ত্রাস ভরা বছরের শেষে ভারতকে আলোচনার বার্তা দিল পাকিস্তান। পাক বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র নাফিস জাকারিয়া বলেন, কাশ্মীর-সহ অন্যান্য সমস্যা বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমেই মেটাতে চান তাঁরা। তবে কাশ্মীর ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব লঙ্ঘন করেছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সেই সঙ্গে বলেছেন, কেউ একতরফা ভাবে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত বা তাতে রদবদল করতে পারে না। যদিও বড়দিনেই তাদের হাতে আটক ২২০ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে মুক্তি দিয়েছে পাকিস্তান। এঁদের অধিকাংশেই গুজরাতের বাসিন্দা। প্রশাসন সূত্রে খবর, বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে চিঠি পাঠিয়েছেন, পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। গতবছর ১০ ডিসেম্বর বিদেশমন্ত্রীর কিডনি প্রতিস্থাপন হয়।

সংঘর্ষবিরতি

সিরিয়ার সংঘর্ষবিরতি নিয়ে নয়া সমঝোতায় পৌঁছল রাশিয়া ও তুরস্ক। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে বিরোধী শিবিরে ছিল রাশিয়া ও তুরস্ক। কিন্তু সম্প্রতি আলেপ্পোয় সংঘর্ষ থামানোর জন্য বাসার আল আসাদ সরকারের সঙ্গে বিদ্রোহীদের আলোচনায় সমঝোতা হয়েছে দুদেশের। এ বার গোটা সিরিয়াতেই সেই সমঝোতা বলবৎ হল বলে দাবি করেছে তুরস্কের সরকারি সংবাদমাধ্যম। মধ্যরাত থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার কথা। এই চুক্তির কথা ঘোষণা করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তুরস্কর জানিয়েছে, বিমানহানা-সহ সব রকম সংঘর্ষ বন্ধ রাখা হবে।

মাতৃঋণ শোধ কি সম্ভব, স্কুল গড়েও রইল আক্ষেপ

সোমা মুখোপাধ্যায়

সারি সারি মাটির দেওয়াল, টালি আর খড়ে ছাওয়া ছাদ। রাস্তা জুড়ে গোরু, ছাগল, হাঁস-মুরগির অবাধ খুনসুটি। কখনও-সখনও পুকুর, বিল, বিঘের পর বিঘে বিস্তীর্ণ ধানি জমির পাশ দিয়ে দু'একটা গাড়ি ঢুকে পড়লে ভিড় করে আসে ছেলেপুলের দল। একেবারে আদর্শ 'পল্লীসমাজ'। কিন্তু এই ২০১৫-তেও কোনও ডাক্তার নেই। শুধু এই গ্রামে কেন, আর আশপাশের বেশ কয়েকটা গ্রামেও সবচেয়ে কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্র ১০ কিলোমিটার দূরে। ট্রেন ধরতে স্টেশন যেতে গেলে বেশির ভাগ সময়েই হাঁটতে হয় ১৫ কিলোমিটার। বড় অসুখ-বিসুখে হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই মৃত্যুর ঘটনা অহরহ। একটি প্রসূতি কেন্দ্র গড়ার কথা হয়েছিল বহু বছর আগে। সেটাও হয়নি। গ্রামে স্কুল আছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে লেখাপড়ার হাল খুব খারাপ।

এমন একটি পরিবেশে আজন্ম বেড়ে ওঠা বৃদ্ধা খায়রুন্নেসা চেয়েছিলেন, বদল আসুক। মানুষগুলো প্রাণে বাঁচুক। ডাক্তার তৈরি হোক। কিন্তু ভাল স্কুলই যদি না থাকে, তা হলে শিশুদের শিক্ষার ভিতটা শক্তপোক্ত হবে কী করে? ভবিষ্যতের কৃতী ডাক্তার তৈরি করার জন্য শিক্ষার ভিতটা যে মজবুত হওয়া দরকার, তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন তিনি।

জীবদ্দশায় খায়রুন্নেসা যা পারেননি, মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরা সেই স্বপ্নকে সফল করতে এগিয়ে এসেছেন, নিজেদের যাবতীয় সঞ্চয় ব্যয় করে বীরভূমের মুরারই থানার প্রত্যন্ত গ্রাম সন্তোষপুরে একটি স্কুল গড়ে তুলেছেন ছেলেরা, যাঁদের মধ্যে একজন এই মুহূর্তে রাজ্যের একটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রেডিওলজি বিভাগের শিক্ষক-চিকিৎসক। তাঁর দাবি, সাধারণ প্রথাগত শিক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকবে না এই স্কুল, পড়ুয়াদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক শিক্ষায় সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন স্কুলের শিক্ষকেরা। নতুন বছরের প্রথম দিনে স্কুলটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হওয়ার কথা। জানুয়ারির শেষ থেকেই শুরু হবে ক্লাস।

রূপকথার মতো এই গল্পের শুরুটা অবশ্য বহু বছর আগে। বর্ধিষ্ণু পরিবারের মেয়ে খায়রুন্নেসার মা গুল আফরোজ নিজেই ছিলেন খানিকটা 'সৃষ্টিছাড়া'। ব্রিটিশ আমলে বহু বছর বাড়িতে একটি 'স্কুল' চালিয়েছেন তিনি। সিলেবাস মেনে প্রথাগত পড়াশোনা না হলেও আরবি, ফারসি, অঙ্ক-সহ আরও বেশকিছু বিষয় শেখানো হতো সেই স্কুলে। বেশির ভাগটাই শেখাতেন তিনি নিজে। মেয়েকে বড় করে তুলেছিলেন সে ভাবেই। নিজের বিয়ে, পাঁচ-পাঁচটি সন্তান হওয়ার পরেও লেখাপড়ার খিদেটা মেটেনি খায়রুন্নেসার। সংসারের কাজ সামলে চালিয়ে গেছেন পড়াশোনা। আর চাইতেন শুধু নিজের সন্তান নয় চারপাশের লোকজনও যেন শিক্ষিত হতে পারে। একের পর এক নিজের গয়না বিক্রি করে নিজের ছেলেদের, আত্মীয়ের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন তিনি। নিজের এক ছেলে কৃতী ডাক্তার হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাতে তাঁর নিজের গ্রাম কী পেয়েছে? এই প্রশ্ন অহরহ বিঁধত খায়রুন্নেসাকে। আর সেই অতৃপ্তি থেকেই গ্রামে সব আগেই একটি আধুনিক স্কুল তৈরি করতে চেয়েছিলেন তিনি। তিন বছর আগে, ৮০ বছর বয়সে নিজের ওই স্বপ্নকে অপূর্ণ রেখেই মারা যান তিনি। আর তারপরেই স্বপ্নটা সংক্রমিত হয় তাঁর ছেলে, চিকিৎসক রেজাউল করিমের মধ্যে। এগিয়ে আসেন তাঁর আরও দুই ছেলে ফজলুল করীম এবং হুমায়ুন করীম। স্কুল গড়তে নিজেদের জমি দিয়ে দেন তিন জনেই। যাবতীয় আর্থিক সঞ্চয় ঢালাতে শুরু করেন রেজাউল। আপাতত কো-এডুকেশন স্কুলটির বাড়ি মোটামুটি তৈরি। এখন প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস শুরু হবে। তারপর ধাপে ধাপে তৈরি হবে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। স্কুলের শিক্ষকরা আসবেন দূরের জেলা বা শহর থেকে। তাঁদের থাকার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে গ্রামে।

এরপর চলবে কী করে? জানা গেল, স্কুলে পড়ার জন্য খুবই সামান্য বেতন নেওয়া হবে পড়ুয়াদের থেকে। এ ছাড়া আপাতত টাকার জোগান দেবেন রেজাউল নিজেই। এই জন্যই সরকারি হাসপাতালের ডিউটি শেষ হওয়ার পরে আপাতত প্র্যাকটিসের সময়টাও বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

স্কুলবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চলছিল স্মৃতিচারণা। ছোটবেলায় এক দিন পড়া ফেলে নমাজ পড়তে যাচ্ছিলেন। বাধা দিয়েছিলেন তাঁর মা। বলেছিলেন, ''এই বয়সে তোমার যে দিকে মন দেওয়া দরকার, তুমি শুধু সেটাই করো।'' রেজাউল বলেন, ''একটা কথা মা বলতেন— খায়রুন্নেসা 'নিজে শিক্ষিত হওয়া আর অন্যকে শিক্ষিত করার চেয়ে বড় ধর্ম আর কিছু নেই।' আমি সেটাই মানার চেষ্টা করছি।'' স্থানীয় বাসিন্দা আবদুল মতিন, যাঁকে এলাকার সবাই 'পীরসাহেব' বলে সম্বোধন করেন, তিনি বললেন, ''মুক্তচিন্তা ছাড়া ভাল মানুষ তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। এই অস্থির সময়ে একটা মুক্ত চিন্তার স্কুল খুব দরকার ছিল। একে ঘিরে এখন আমাদের অনেক আশা।''

স্কুলের পাশেই সর্ষে খেত। হলুদ আলো ছড়াচ্ছে চার পাশে। সে দিকে তাকিয়ে রেজাউল জানাচ্ছিলেন তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। আরও জমি দরকার। কারণ একটা ভাল লাইব্রেরি তৈরি করতে হবে। ছেলেমেয়েদের খেলার মাঠও দরকার। ''কর্মসূত্রে গ্রামের বাইরে থাকতে হলেও গ্রামের মানুষকে আমি ভুলিনি। ভুলিনি আমার মায়ের লড়াইয়ের কথাও। ওই সামান্য কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি।''

মাতৃঋণ শোধের চেষ্টা? ''দূর, তা কখনও হয় নাকি? বরং মাতৃঋণ স্বীকার করা বলতে পারেন।'' বিষণ্ণ শোনায় প্রৌঢ় চিকিৎসকের গলা।

সৌজন্যে: আনন্দবাজার পত্রিকা

এক নজরে

তোপ ট্রাম্পের

টুইটারে প্রথমে প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বললেন, বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা উস্কানিমূলক মন্তব্য এবং বিভিন্ন বাধা সৃষ্টি করে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া মসৃণ হতে দিচ্ছেন না। কূটনীতিকদের মতে, বাধা বলতে ইজরায়েল প্রশ্নে ওবামার অবস্থান-সহ বিভিন্ন নীতি নির্ধারক সিদ্ধান্তের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন ট্রাম্প। কিন্তু ফ্লোরিডায় যখন এ নিয়ে ট্রাম্পকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন তখন ট্রাম্প বলেন, ''ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া অত্যন্ত মসৃণ ভাবেই চলছে, তাই না?'' ওবামার সঙ্গে তাঁর ফোনেও কথা হয়েছে বলে জানান প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট।

প্রয়াত ডেবি

দু'দিন আগেই ষাট বছর বয়সে মারা গিয়েছে মেয়ে। স্টার ওয়ার্স-এর প্রিন্সেস চরিত্রাভিনেত্রী ক্যারি ফিশার, যিনি গায়ক পল সাইমনের প্রাক্তন স্ত্রীও। সেই শোকের মধ্যেই চলে গেলেন মা ডেবি রেনল্ডস (৮৪)। রুপালি হলিউডের সাড়া জাগানো নায়িকা, 'সিঙ্গিং ইন দ্য রেন' -এ জিন কেলির বিপরীতে যিনি কিংবদন্তি।

নতুন আমির

আবার নতুন রূপে আমির খান। চুল ব্যাকব্রাশ করা। দাড়ি ছেঁটে করে ছুঁচো। সোনালি চুল। 'সিক্রেট সুপারস্টার'-এ নাকি আমির ধরা দিয়েছেন এই রূপেই। তাঁর প্রাক্তন ম্যানেজার অদ্বৈত চন্দনের পরিচালনায় প্রথম ছবিতে এক 'ক্যামিও' চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি।

Planning a Wedding, Anniversary, Birthday Party or Celebrating a Special Occasion?

Consider

Tagore Hall at Ananda Mandir!

This beautiful new facility can meet all your party needs:
Seating capacity, dance floor, well equipped stage, ample parking

***

For information on rental availability and charges
contact the managing agents:

Maureen: (732) 492-5580 or Troy: (732) 343-0082
Email: momonev@aol.com

অহেতুক বিতর্কে ভুগছে গরিবরাই স্কুলে পাস-ফেল এখনই চালু হোক

নিখিল কবিরাজ

শিক্ষায় পাস-ফেল থাকা উচিত কি না এবং প্রথম শ্রেণি থেকেই পাস ফেল থাকা উচিত কিনা, এটা আজ আর কোনও বিতর্কের বিষয় নয়। যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে একমত। যে সকল শিক্ষক-অভিভাবক-সাধারণ কিছু মানুষ দলীয় অন্ধ আনুগত্যে নির্ভর করে ৮০-র দশকে পাস-ফেল তুলে দেওয়াকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁরা বর্তমানে আত্মযন্ত্রণায় ভুগছেন। আর বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে কিছু মানুষ সেই ৮০-র দশক থেকে আজও পাস ফেল ফেরানোর দাবিতে অনড়। যাঁরা আজও ষষ্ঠ না পঞ্চম না অষ্টম, কোন শ্রেণি থেকে পাস-ফেল চালু করা উচিত সেই বিষয় নিয়ে গবেষণা এবং দর-কষাকষিতে ব্যস্ত তাঁরা শিক্ষার ভিতকে শক্ত করতে চান কি না সন্দেহ আছে। গাছের গোড়াকে দুর্বল করে গাছটিকে শক্তপোক্ত করা যায় কি? না হলে কোটি কোটি ছাত্রের শিক্ষার ভবিষ্যৎ ধ্বংস হওয়ার পরেও কেন তাঁরা পাস ফেল চালুর ব্যাপারে নাটক করছেন! প্রায় ৩৭-৩৮ বছর আগে প্রাথমিকে পাস ফেল তুলে দিয়ে কত ক্ষতি হয়েছে, সব সরকারই জানে, এ সংক্রান্ত যতগুলি কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, সেগুলি খুবই ভয়ঙ্কর। শিক্ষা ভারতীয় সংবিধানে যৌথ তালিকাভুক্ত হলেও এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে নেওয়ার দায় নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ধারাবাহিক তরজাগান গেয়ে চলেছে। রাজ্য বলছে, আমরা তো চাই, কিন্তু কেন্দ্রের বাধা। আর কেন্দ্র বলছে, রাজ্যগুলি তার নিজ নিজ ক্ষেত্রে আলাদা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আবার বলছে রাজ্যগুলির মতামত নিচ্ছি। অথচ সবাই জানি যে, কিছু বাদ দিয়ে প্রায় সব রাজ্যই পাস ফেল চালুর পক্ষে মত জানিয়েছে। আসলে এই সব নকল লড়াইয়ের মাধ্যমে তারা যতদূর সম্ভব পাস-ফেল চালু করতে দেরি করা যায় তার চেষ্টা করছে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। সরকারি স্কুলে পাস ফেল না থাকার জন্য অবস্থাপন্নরা বেসরকারি স্কুল খুলে ছুটিয়ে ব্যবসা করতে পারছে, গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, পরবর্তীকালে বহু ছেলে-মেয়ে দুষ্কৃতি প্রবণতায় ঝুঁকে পড়ছে, ছাত্র-শিক্ষক সুসম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে।

'শিশু মনে চাপ', 'পরীক্ষা ভীতি' ইত্যাদি নানান অজুহাতে ৮০-র দশকে পাস-ফেল তুলে দেওয়া হয়েছিল। ফলে প্রথম সারি থেকে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষায় শেষের দিকে চলে এল। কয়েক বছর আগের রিপোর্ট

অনুযায়ী, পঞ্চম শ্রেণিতে ওঠার পর শতকরা ৭০-৮০ ভাগ ছাত্রছাত্রী শিক্ষাঙ্গন থেকে হারিয়ে যায়। মিড-ডে মিল দিয়েও ছাত্র ধরে রাখা যাচ্ছে না। গত কয়েক বছরে ৩০০০-র বেশি প্রাইমারি স্কুল উঠে গেছে। অন্য এক রিপোর্ট বলছে ক্লাস ফাইভের শতকরা ৬৭ জন ছাত্র ক্লাস ওয়ানে বই পড়তে পারে না। রাজ্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের ৬৩ শতাংশের বেশি ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে পারে না। ৫৪ শতাংশ দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা বই পড়তে পারে না। ৬৫ শতাংশ সরল বিয়োগ করতে পারে না। যেসব অভিভাবক নিজেদের সন্তানদের দেখভাল করার সময় পান না, তাঁদের সন্তানরাই ভবিষ্যতে শিক্ষাঙ্গন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। অভাবের সংসারে অনেক বাবা-মা তাঁর সন্তানকে স্কুলে না পাঠিয়ে কোনও চায়ের দোকানে বা রেস্তোরাঁয় পাঠান, যারা স্কুলে যায় তাদের স্পেশাল গাইড নেওয়ার সামর্থ্য নেই। ন্যূনতম লক্ষ্য না পেলে অন্য ক্লাসে ওঠা যায় না, এই চাপ না থাকার জন্য সে ডাংগুলি খেলতে খেলতে পাস-ফেলহীন ক্লাসগুলি অতিক্রম করবে। তারপর দিশাহীন হয়ে পড়বে। সে উচ্চশিক্ষায় যেমন যেতে পারবে না, তেমন কোনও চাকরির পরীক্ষায় সফল হবে না। অথচ ধনী বাড়ির ছেলে-মেয়েরা, যারা স্পেশাল গাইড নিয়ে প্রচুর পয়সা খরচ করেছে, প্রয়োজনে বহু টাকা দিয়ে বেসরকারি স্কুলের গণ্ডি পার হয়েছে, তারাই উচ্চশিক্ষায় যাবে এবং চাকরি-বাকরি করবে। অর্থাৎ নো ডিটেনশন পলিসি গরিব ছেলে-মেয়েদেরই বেশি ক্ষতি করছে।

২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে ৩২ লক্ষ শিশু। ২০১০ সালে সেই ব্যাচে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় ৮ লক্ষ পরীক্ষার্থী। অর্থাৎ ৭৫ শতাংশই ড্রপ আউটের শিকার। যার প্রায় বেশিরভাগই গরিব বাড়ির ছেলে মেয়েরা। অথচ প্রথমদিকে পাস ফেল ছিল না, 'শিশুমনে চাপ' ছিল না, 'পরীক্ষা ভীতি' ছিল না। তা হলে কেন এমন হল! পরীক্ষা ব্যবস্থা শুধুই ছাত্রদের পরীক্ষা নয়, শিক্ষক কতখানি শেখাতে পেরেছেন, তাও দেখা। অর্থাৎ পরীক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষকদেরও পরীক্ষা। সেইজন্য ইংরেজি ও পাসফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে সুকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায়, প্রতুল গুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, মানিক মুখার্জি, সুনীতিকুমার মুখার্জি প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিরা রাস্তায় নেমেছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার এঁদের কথা শুনলে, শিক্ষার বর্তমান দুরবস্থা দেখতে হত না। কিন্তু দুঃখে বর্তমান তৃণমূল সরকার-ও এখনও পর্যন্ত একই পথে হাঁটছে। অথচ ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তারা পাস ফেল ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। শিক্ষা হল যৌথ তালিকাভুক্ত। সেক্ষেত্রে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের শিক্ষানীতি হুবহু মানতেই হবে, এটা নাও হতে পারে। রাজ্য সরকার আলাদা নিয়ম করতেই পারে বলে আমার বিশ্বাস। যেমন বিভিন্ন রাজ্য ছাত্রদের থেকে যে ফি নেয়, সেটা এক এক রাজ্যে এক এক রকম। সব রাজ্যেই যৌন-শিক্ষা চালু নেই। এক এক রাজ্যে ডাক্তারি কোর্স (৩/৪/৫ বছর) আলাদা আলাদা সময়ের ছিল। কেন্দ্রের পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার বিরোধিতা করে কেন? এক্ষেত্রে রাজ্যসরকার তো মানতেই পারত। অথচ তেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ তো যৌথ তালিকায় নয়, কেন্দ্রের হাতে। যেটা কেন্দ্রের হাতে, তার বিরোধিতা করা যায়, অথচ যৌথ তালিকার বিষয়টি (শিক্ষা) নিয়ে বিরোধিতা করা না কেন? ফলে পঞ্চম না ষষ্ঠ না চতুর্থ — কোন শ্রেণি থেকে পাস ফেল শুরু হবে এই বিভ্রান্তির আলোচনা করে কালবিলম্ব করে আরও কয়েক লক্ষ ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা বন্ধ হোক। অনেক নাটক হয়েছে, অনেক তরজা হয়েছে, এবার সদর্থক পদক্ষেপ হোক। জনমতকে সমর্থন করে, শিক্ষক-শিক্ষাবিদদের অভিজ্ঞতা ও মতকে মর্যাদা দিয়ে, দেশের কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীদের সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাতে অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকেই পাস ফেল চালু করা হোক।

—সৌজন্যে আজকাল (১৫/১২/১৬)

খরচ কমাতে ৬৩ থেকে কমিয়ে রাজ্য সরকারের দপ্তর এখন ৫২

খরচ কমাতে এবং কাজের গতি বাড়াতে প্রশাসনিক সংস্কার করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনের ভার কমাতে রাজ্য সরকারের দপ্তরের সংখ্যা ৬৩ থেকে কমিয়ে করা হল ৫২। ২১টি দপ্তরকে জুড়ে ১০টি দপ্তর করা হল। ১১টি দপ্তরকে গুটিয়ে ফেললেন মুখ্যমন্ত্রী। বাম আমল থেকেই মাথাভারী প্রশাসনকে হালকা করার প্রয়াস নেওয়া হলেও তা সফল হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা করে দেখিয়ে দিলেন। তবে দপ্তর কমলেও কোনও মন্ত্রীর চাকরি তিনি খাননি। সব মন্ত্রীকেই বহাল রেখেছেন। কয়েকজন মন্ত্রীর দপ্তর অদলবদল হয়েছে কেবল। তবে বেশ কয়েকজন সচিবের পদ অবলুপ্ত হয়ে গেল। সেই সঙ্গে দপ্তরের কাজকর্মকে আরও তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর করার জন্য ই-গভর্ন্যান্সের উপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কারণে ই-গভর্ন্যান্স নামে নতুন বিভাগ তৈরি করে কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার (পার) দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। দপ্তরের নাম দিলেন 'পার অ্যান্ড ই-গভর্ন্যান্স'। এই দপ্তরটি মূলত মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে রইল।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের অধীন ডিরেক্টরেট অব সেরিকালচারকে কৃষি দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত করা হল। ফলে এখন থেকে এটি দেখবেন কৃষিমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু। পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরকে স্বরাষ্ট্রদপ্তরের অধীনে নিয়ে আসা হল। এই দপ্তরের মন্ত্রী হলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরকে একসঙ্গে যুক্ত করা হল। যার মন্ত্রী হলেন অরূপ বিশ্বাস। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরকে ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত করা হল। এই দপ্তরও চলে এল মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। প্রথমে অবনী জোয়ারদারকে উদ্বাস্তু দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পরে তিনি অসুস্থ হওয়ায় রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই দপ্তরের দায়িত্ব দিয়েছিলেন মমতা। রাজীবের হাত থেকে এই দপ্তরটি চলে গেল। নারী-সমাজ কল্যাণ এবং শিশুদপ্তরকে একসঙ্গে করে একটি দপ্তর করা হল। যার মন্ত্রী আগে থেকেই ছিলেন শশী পাঁজা।

বিপর্যয় মোকাবিলা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরকে একসঙ্গে যুক্ত করে একটি দপ্তর করা হল। যার মন্ত্রী রইলেন জাভেদ খান। তিনি এই দু'টি দপ্তর দেখতেন। বিজ্ঞান-কারিগরি, বায়ো টেকনোলজিকে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এতদিন এই দু'টি দপ্তর দেখতেন মন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন সবটাই চলে এল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। নগরোন্নয়ন এবং পুর বিষয়ক দপ্তর এতদিন আলাদা ছিল। এদিন দু'টি দপ্তরকে এক করে দেওয়া হল। দু'টি দপ্তরই দেখতেন ফিরহাদ হাকিম। এখন তিনিই দেখবেন। পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান এবং প্রকল্প মনিটরিং। আগে দু'টি দপ্তর দেখতেন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন নতুন দপ্তর দেখবেন তিনি।

—সৌজন্যে বর্তমান (১৪/১২/১৬)

মা মেয়ের আদালত

১৬ পাতার পর

বলল বিয়ে দিলে এসব রোগ কেটে যায়...!

— আমি কি বিয়ের আলোচনায় ছিলাম? তাহলে মামলা করুন ক'বছর ধরে, জজসাহেব বিচার করবেন।

— সে জন্যে তো, এখানে আসা নয় স্যার?

— তাহলে ভেবে বলুন কী করবেন?

— ওঁ গয়নাগুলো জিনিসপত্র কবে ফেরত নেবেন স্যার?

— সেটা দু'পক্ষের উকিল ও মেয়ে পক্ষ বসে ডেট ঠিক করবে। আর...

— আর কী স্যার?

আনাড়ি উকিল জীবনবাবুর চোখ মুখ একটু মেপে বলে, খোরপোশ ... অ্যালিমনি বাবদ টাকা পয়সা?

— কত স্যার?

— লাখ চোদ্দো পনেরো

— মানে...! স্যার অত...!

— বিয়ে দিতে খরচ হয়নি মেয়েদের?

— আমাদেরও তো হয়েছে স্যার?

পাঁচ

মস্ত জলাশয় ঘিরে বাড়িবনে পিকনিক স্পট। সেটা ফেলে বাস থেকে নামতেই তিন মাথানি মোড়। এলাকায় দেশি মদ ও গোপনে চুল্লু ব্যবসা আর সঙ্গে বড় সিমেন্ট বালির কারবারি ভোলাদার কালী মন্দির। পাশেই দু'লাখ টাকা অনুদান প্রাপ্ত নতুন ক্লাব ঘর। পি ডব্লু ডি'র জায়গা অন্দর দখল করে শ্বেতপাথরের বাঁধানো মন্দিরে কালী মূর্তি। প্রণাম করে মুখটা তোলে জীবনবাবু।

তার চোখে, কালী মূর্তির জিভের উপর বাল্বের আলো পড়ে ভীষণ টকটকে লাল...! মায়ের হাতে ধারালো খড়্গটি ঝলসে ওঠে জীবনবাবুর মস্তিষ্কে। মুহূর্তে ভাবে, পনেরো লাখ...! খোরপোশ, না বিবাহের মোড়কে আইনের হাতে রোগ বেচা কেনা...!

বাজার ভর্তি দুটো ব্যাগ দু'হাত থেকে নামায় মধ্য বয়সী বিধবা। কালীমূর্তিকে গড় সেরে পাশেই বিড় বিড় করে মহিলা, মা গো মেয়েটাকে নিয়ে যে কী...

ইট বিছানো নতুন পথ। কয়েক পা হেঁটে নিজের কাঁধে ঝোলানো কিটস ব্যাগটার গায়ে হাত বুলিয়ে আন্দাজ নেয় জীবনবাবু, অন্তরীণ কাগজপত্র, মেডিক্যাল রিপোর্ট, ম্যাট্রিমনিয়াল কেসের সার্টিফায়েড কপি। মহিলা পাশ কাটাবার আগেই জীবনবাবু বলে, তুমি শ্রীধর... শ্রীধর সামন্ত... হেল্থ ডিপার্টমেন্টে পিয়নের কাজ করত... তার পরিবার?

— হ্যাঁ। তাই আমার ঘাড়ে দায় চাপিয়ে মানুষটা গত...

— পেনশন পাও তো? তবে?

— পেলেই বা কী বাবু? যে দিয়েছিলুম মেয়ে দুটোকে

— বাঃ! তাহলে তো মা হিসেবে কাজের কাজ সেরে ফেলেছে?

চাপা নিঃশ্বাস কাছের বাতাসে, আর সারা...! মেয়েটিকে জামাই তুলে দিয়ে গেছে আমার ঘরে। আর নিবেনি

— কেন?

— মেয়েটা থেকে থেকে এই ভালো...। আবার উৎপাত! মাথার ব্যাধি গো বাবু? ভাবলুম, বিয়ে দিলে যদি সারে...! সারে কই..., বড্ড দীর্ঘ সে শ্বাস! আকাশে মেশে।

— উঁহু। এক্ষুনি থানায় গিয়ে, বলো। কেস দেবে

— দিলে...?

— জামাই, বেয়াই বেয়ানের সঙ্গে ননদ থাকলে, নিশ্চিত জেল। এককালীন টাকা পাবে জামাইয়ের কাছ থেকে — খোরপোশ পাবে মেয়ে তুমি তো মেয়ের মা...? এটুকু করবে না? এক্ষুনি যাও —

মাথার উপর দিয়ে মেঘ চলে যায়। সমস্ত গা-বুকের ভার দু'হাত বেয়ে দু'ব্যাগে জমে পাহাড়। ধীরে ধীরে ব্যাগ দুটো নামায়। বিধবার গলা ভিজে যায়, না গো বাবু... আমার মেয়েটারই অসুখ। কোন পাপে যে আমার মেয়েটারই অসুখ। কোন পাপে যে আমার পেটের মেয়ের এমন খারাপ রোগ...! তার উপর পরের ছেলেকে মামলায় কষ্ট দিয়ে আবার মহা পাপ করব..!

—সৌজন্যে বর্তমান

উদীয়মান রোয়িং চ্যাম্পিয়ন ময়ূরাক্ষী মুখোপাধ্যায়

কাকলী পাল বিশ্বাস

ময়ূরাক্ষী মুখোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সুযোগ পাওয়া একমাত্র রোয়িং খেলোয়াড়। এ বছর ইন্টারন্যাশনাল খেলেছেন তিনি ও ভারতের জন্য পদক জয় করে এনেছেন। হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশনের দ্বিতীয় বর্ষের এই মেধাবী ছাত্রীটির ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলোর প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। ময়ূরাক্ষী ছোটবেলা থেকেই সাঁতার শিখতেন। স্কুলে বাস্কেটবল খেলতেন, ক্যারাটেও শিখতেন। এর মধ্যে আবার ক্যারাটেতে ন্যাশনাললেভেলও পার করেছেন তিনি। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময়ে হঠাৎ করেই রোয়িংকে বেছে নেন। বর্তমানে কলকাতার প্রায় সব স্কুলেই রোয়িং শেখানো হয়। সুতরাং খেলাধুলোর প্রতি আকর্ষণেরআগ্রহী ময়ূরাক্ষী রোয়িংয়ের জন্য স্কুল টিমে সুযোগ পেয়ে যান। অন্যান্য খেলার মতো রোয়িংও জোরকদমে চলতে থাকে। কিন্তু প্রথম যখন রোয়িংয়ে চ্যাম্পিয়ন হন তিনি তখন নিজে উপলব্ধি করেন যে যদি এই খেলাটা ঠিকঠাক খেলা যায় তাহলে ভবিষ্যতে এটা নিয়ে কিছু একটা করতে পারবেন। যেমন ভাবা তেমন কাজ। এরপর থেকে রোয়িংকেই ধ্যানজ্ঞান করে এগতে থাকেন ময়ূরাক্ষী। স্কুল লেভেল শেষ করে একে একে স্টেট লেভেল, ন্যাশনাল লেভেল এবং সর্বোপরি ইন্টারন্যাশনাল লেভেল — সব

লেভেলেই ময়ূরাক্ষী তাঁর কৃতিত্ব বজায় রেখেছেন। ময়ূরাক্ষীর রোয়িং-এর কোচ সুদীপ সাহা।

রোয়িং-এর ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই খেলা স্কুলে পড়াকালীন শুরু করে একটু বড় হয়ে সবাই তা ছেড়ে দেয়। কারণ, পড়াশুনোর চাপ। কিন্তু ময়ূরাক্ষীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উলটো ঘটেছে। তাঁর বাবা মিলন মুখোপাধ্যায় এবং মা সাগরিকা মুখোপাধ্যায় সর্বক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করেছেন এবার ইন্টারন্যাশনালের সময় ওঁরা মেয়ের সঙ্গে যেতে পারেননি। সেই সময় ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে ছিলেন টিম মেম্বাররা, কোচ ও টিম ম্যানেজার। ভারতের জন্য পদক আনার স্বপ্ন বুনে রোয়িং খেলতে গিয়েছিলেন ময়ূরাক্ষী। সেই স্বপ্ন সফলও হয়েছে।

এই ভারতীয় রোয়িং টিমের অনেক বড় সাফল্য। ময়ূরাক্ষীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী? তাঁর কথায় — বর্তমানে সিনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সেখানে নির্বাচিত হলে এশিয়ান গেমসে সুযোগ পাবেন। আর তারপরের লক্ষ্য ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ এবং টোকিও অলিম্পিক।

আমরা সবাই ময়ূরাক্ষীর এই সাফল্য কামনা করি। যাতে তিনি আবার আমাদের দেশের জন্য পদক জয় করে আনতে পারেন। দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল করেন। শুভেচ্ছা রইল।

—সৌজন্যে বর্তমান (৩১/১২/১৬)

ঝলকে

সন্তানের মতো

তাঁর বয়স ৬৫ পেরিয়ে গিয়েছে। অথচ, মঞ্চে দীর্ঘক্ষণ অনুষ্ঠান করতে এখনও তিনি অক্লান্ত। বয়স সত্ত্বেও তিলমাত্র ক্লান্তি নেই কেন গান গাওয়ার ব্যাপারে? এই প্রশ্ন করা হয়েছিল স্টিং-কে। জবাবে তিনি বলেছেন, 'আমার প্রতিটি গানই আমার সন্তানের মতো। তারা জীবন্ত। ওই সন্তানের সঙ্গে সময় কাটাতে ক্লান্তি আসবে কেন? আমার লেখা প্রতিটি গান ওই নতুন নতুন চেহারায় আমার কাছে উঠে আসে। প্রতিরাতে ওরা নতুন হয়ে

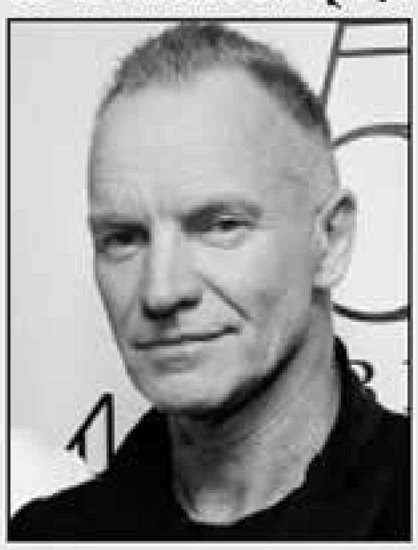

উঠে আমার কাছে। ওই ক্লান্তিবোধ করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বরং সময়টা আমাকে খুশি করে।'

বাইরে থেকে

বলিউডে এই নায়িকা সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে যেভাবে তরতর করে উঠেছেন, সেটা দেখার মতো। তিন খানের সঙ্গেই নায়িকার ছবি সুপারহিট। নতুন করে পা রাখার আগে, অনুষ্কা শর্মা নিজেই জানালেন, কীভাবে তিনি সফল হয়েছেন। নায়িকার কথায়, 'বলিউডের বাইরে থেকে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পা রেখেছি বলেই, আমার কোনও প্রি-কনসিভড নোশন ছিল না, কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়, তাই নিয়ে। হয়তো

সেটাই কাজটা সহজ করে দিয়েছে।' অন্যদিকে বছর শেষে বিরাট কোহলির সঙ্গে ছুটি কাটিয়েছেন নায়িকা বলেও খবর।

টুইঙ্কল টুইঙ্কল

কম বয়সে তাঁর মারাত্মক 'ক্রাশ' ছিল টুইঙ্কল খান্নার উপর। এমনই জানিয়েছেন শাহিদ কাপুর। জানিয়েছেন, সবসময় বন্ধুদের কাছে তিনি টুইঙ্কলের

কথা বলতেন। তাঁর ছবি দেখতেন। এমনকী একবার টুইঙ্কলের গাড়ি দেখার জন্য এক হোটেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষাও করেছেন। সে ছবিতে রাজ বব্বর, অমরীশ পুরী, অজয় দেবগণের মতো স্টাররা ছিলেন। কিন্তু শাহিদ ঠায় দাঁড়িয়েছিলেন টুইঙ্কলের জন্য। শাহিদ কিন্তু অকপটে জানিয়েছেন, সাহসী বলতে হয়।

বাবার বকা।

ফারহান আখতারের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী-র আলাদা হয়ে যাওয়ার পিছনে রয়েছে কোন নায়িকা, তা নিয়ে বলিউডে একের পর এক জল্পনা। বেশ কিছুদিন ধরেই উঠছে, শ্রদ্ধা কাপুরের নামও। একই

ছবিতে কাজ করার পর শ্রদ্ধা আর ফারহানের ঘনিষ্ঠতা নাকি বেড়েছে। এমনকী ফারহানের অ্যাপার্টমেন্টেও নাকি প্রিয় হয়ে উঠেছে এই নায়িকার। তবে সেই শুনে নাকি মোটেও খুশিও নন, শ্রদ্ধার বাবা শক্তি কাপুর। মেয়েকে নির্দেশ দিলেন, এসব থেকে দূরে থাকতে।

সৌজন্যে – এই সময়

সিনেমা

দঙ্গল

সাহানা নাগচৌধুরী

মধ্যবয়সি, মোটাসোটা হরিয়ানার বাসিন্দা কুস্তিগীর মহাবীর সিং ফোগাট। তাঁর স্বপ্ন ছিল সোনা জেতার, কিন্তু সেই কাজে তিনি ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ভাবী পুত্রের মাধ্যমে সোনা আনার স্বপ্নে মশগুল ছিলেন। কিন্তু বিধি বাম হওয়ায় তাঁর পর পর চারটিই কন্যা হয়। প্রথম দুই কন্যা গীতা ও ববিতার মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁর স্বপ্নপূরণে উদ্যোগী হন। কারণ তিনি মনে করেন, 'গোল্ড তো গোল্ড হোতা হ্যায়, ছোরা লা যে ছোরি'। সিনেমায় এই আপ্তবাক্যটি এত সহজ নয়, অন্তত হরিয়ানার বালালি গ্রামের ক্ষেত্রে। হরিয়ানার সমাজ এখনও খাপ পঞ্চায়েত দ্বারা প্রভাবিত। সেখানে শিশুকন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই খুন হয় অথবা চলে 'অনার কিলিং'। সেই আদিম সমাজ ব্যবস্থার মনে দাঁড়িয়েও মহাবীরের দুই মেয়েকে ঘিরে স্বপ্ন বোনা, আর তার চরিতার্থ করা। আর তাঁর স্বপ্ন পূরণের সিঁড়ি হল কুস্তি নামক খেলাটি। মহাবীরের এই দুই কন্যা যখন এই গ্রামে বাবার অধীনে কুস্তি শিখতে বাধ্য হয়, তখনই আমাদের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান নারী বনাম পুরুষের চিরন্তন লড়াই জ্যোতিষী ব্যবস্থার প্রতি এক তীব্র বিদ্রুপ। লাঞ্ছনা, টিটকিরি এসব কিছুরমধ্যে থেকে মাথা তুলে দাঁড়ায় কুস্তি অঙ্গনে মহাবীর ফোগাটের দুই কন্যা গীতা আর ববিতা। গীতা রাজ্য, ন্যাশনাল এবং কমনওয়েলথ থেকে সোনার মেডেল এবং ববিতা রুপোর মেডেল এনে মহাবীরের দীর্ঘদিনের এক আশাকে পূর্ণ করে। মেয়ে দুজনেই দেশের মুখ উজ্জ্বল করে, গ্রামে তাদের নিয়ে শুরু হয় উৎসব।

দঙ্গলের গল্পের মূল নির্যাস এইটুকুই। দর্শকরা ছবিটি দেখেন দুই বোনের এক তুতো ভাইয়ের মাধ্যমে। যে মহাবীরের এক ব্যর্থ ছাত্র, কিন্তু অবাধ্য নয়, এই পরিবারটিকে হাতে আঙুর মতো চেনে। ফলে পুরো ছবিজুড়েই আছে এক নিটোল গল্প, যা মনকে ছুঁয়ে যায়। পরিচালক নীতেশ তেওয়ারি এখানেই সার্থক।

কিন্তু পরিচালক এর পাশাপাশি তুলে এনেছেন এমন কুস্তিগীরকে যিনি একজন সম্পূর্ণ পারিবারিক কর্তা, একাধারে স্নেহশীল এবং কর্তব্যপরায়ণ। মহাবীর ফোগটের কুস্তির মতো এক খেলাকে ঘিরে যে উন্মাদনা তা দর্শকদের মধ্যে চারিয়ে দিয়েছেন ধীরে ধীরে। কোনও অশ্লীলতা নেই, নেই অতিকথনও। সমস্ত ছবি জুড়ে আছে অভিনেতাদের নিখুঁত অভিনয়। কাকে ছেড়ে কাকে বলব। মহাবীরের কথায় পরে আসছি। প্রথমেই বলি তাঁর স্ত্রীর অনুচ্চারিত অভিনয়ে সাক্ষী তানওয়ার অনবদ্য। আর দুই কন্যা গীতা আর ববিতা? ছোটবেলার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জাইরা ওয়াসিম ও সুহানি ভাটনাগর। বড়বেলায় ফতিমা সানা শেখ ও সান্যা মালহোত্রা। স্টার ইমেজকে ছুঁড়ে ফেলে এরা যে ঘাম ঝরানো, কান্না ঝরানো, রক্ত ঝরানো অভিনয় করেছে তার ভাষা নেই।

পরিশেষে বলি ছবির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আছেন মহাবীর সিং ফোগাট। অনেকটা দক্ষ ড্রাইভারের মতো সিনেমাটিকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন। একটুকুও বাড়তি অভিনয় হলেই ছবিটি ঝুলে যেত। একান্ন বছরের আমির আবার তাঁর সমসাময়িক অভিনেতাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন আরও কয়েক কদম। মহাবীর যে সুলতান নয়, তা বুঝিয়ে দিলেন। তিনি এটাও বুঝিয়ে দিলেন এই ছবি কোনও পুরস্কারের দৌড়ে নেই। পাখির চোখের মতো তিনি পড়ে ফেলতে পেরেছেন দর্শক মন।

ছবিটিকে অক্সিজেন যুগিয়েছেন সুরকার প্রীতম চক্রবর্তী ও গীতিকার অমিতাভ ভট্টাচার্য। গায়ক দালের মেহেন্দির গায়ে যে অপরাধের কালো দাগ লেগেছে তা হয়তো কিছুটা লাঘব হবে এই ছবিতে। কারণ তাঁর গানই এখন ছবির শেষে লোকের মুখে মুখে।

মমতার দয়ায় মোদি আসনে বসেননি

প্রথম পাতার পর

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দপ্তরের সামনে ধরনাও দিয়েছেন তিনি। আর সেই দিল্লিতে রাহুল গান্ধীর পাশে বসে সাংবাদিক সম্মেলন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধীদের চাপে কিছুটাও হলেও যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার চাপ অনুভব করছে, তা বেঙ্কাইয়ার আজকের দুপুরবেলা আক্রমণেই প্রমাণিত। পাশাপাশি নোট বাতিলের পক্ষে বারবার সওয়াল করে গিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, নোট বাতিল হল কালো টাকা আর দুর্নীতি রোধের একটি যজ্ঞ। কিন্তু পুরাণে যেমন অসুররা যজ্ঞ ভণ্ডুল করতে চাইত, বিরোধীরা তাই। কিন্তু তারা যতই চেষ্টা করুক, এই যজ্ঞে প্রধানমন্ত্রীর জয় হবেই।

সৌজন্যে- বর্তমান (৩০/১২/১৬)

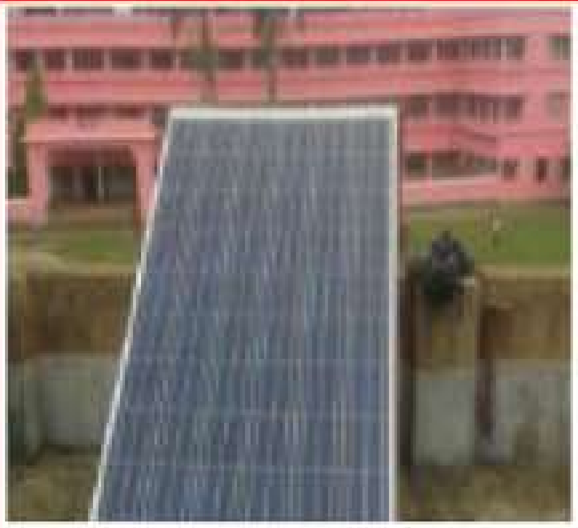

ANUKAR CHARITABLE FOUNDATIONS.ORG

DONATE NOW

Learn the ABCDS of Life and Enjoy by Helping the Needy. ***Donate for Our Noble Causes (Use PAYPAL via ANUKAR site or mail services).***

A) **Alcohol** - A "No-Drinking" pledge from students, until finishing college, can qualify them for help from ANUKAR Foundations
B) **Breast Cancer** - Remedy for 40-year-olds with research help from ANUKAR Foundations
C) **Calculus, Mathematics and Science Education** - Students aged 10 - 21 years of age can apply for help from ANUKAR Foundations
D) **Drugs** - Research help from ANUKAR Foundations to help stop consumption of pain killers and replace with natural remedies.
S) **Solar Energy** - ANUKAR Foundations help worldwide poor families with solar lighting through Robi Solar ***Alcohol and Drugs Rehabilitation:*** Students, who make a promise to abstain from alcohol and drugs (prescribed or non-prescribed), can apply for help from ANUKAR Charities. This assistance can continue through college if promise is kept. We have witnessed it ourselves; by loving them first until they can **love** themselves, has proven that this ***four letter word*** is the most powerful four letters of them all. ***Breast Cancer*** Working with the victims of cancer, providing educational, emotional, and spiritual support are our goals. Help us support cancer victims. ***Calculus or Mathematics*** provide the basis of the all the sciences. Many Europeans and Asians countries are ahead of US students. ***Solar Energy:*** Robi Solar Corporation (www.robisolar.com) **will install panels to bring electricity and accessibility to families who live remote from civilization.** ROBI Solar installed this panel in KULTOLI in SUNDARBAN village where there was no electricity. Now, students are coming day and evening for their school and coaching class Contact: ANUKAR 1430 SW Woodhull Street, #4959 Topeka, Kansas 66604 USA t: (785) 422-2269 e:info@anukarcharitablefoundations.org ANUKAR CHARITABLE is 501 (C) (3) Exempt Private Foundation EIN 46-1238380 **"If money help people to do well to others, it is of some value; but if not, it is simply a mass of evil, and the sooner it is got rid of, the better." – Vivekananda**

২০১৬ বঙ্গ সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবকরা স্বীকৃতি পেলেন

২০১৬ বঙ্গসম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দকে তাঁদের কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগের স্বীকৃতি দিলেন ২০১৬র বঙ্গসম্মেলনের পরিচালক বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ (সি এ বি) গত রবিবার (জানু ৮, ২০১৭) আনন্দমন্দিরের টেগোর হলে সান্ধ্য ভোজে আপ্যায়ন করে। বঙ্গ সম্মেলনের পরিচালন কমিটির সদস্য পূর্ণ ভট্টাচার্য ও CABর সভাপতি মিলন অয়ন তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকদের নিষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই অনুষ্টানে মনোরঞ্জনের জন্য একটি ছোট সাংস্কৃতিক অনুষ্টানের আয়োজন করা হয়েছিল।